তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ

প্রথম পর্ব

আয়াত : ১-১১

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ

[প্রথম পর্ব]

আয়াত: ১-১১

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

শেষ্টিম প্রকাশনী

তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ (প্রথম পর্ব)

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্বঃ অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশঃ রজব, ১৪৪৭ হিজরী
ডিসেম্বর, ২০২৫ ঈসায়ী

মুদ্রণঃ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়াঃ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ https://cutt.ly/akhirujjamanbooks
https://gazwatulhind.site
https://dl.gazwatulhind.site

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

TARJAMA E SURAH MUHAMMAD (1st Part) WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: DECEMBER 2025 ISAYI, RAJAB 1447 AH HIJRI.

উপহার

.....

.....

.....

.....

.....

.....

এর পক্ষ হতে

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চেনে। পিতা আব্দুল কুদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল কুদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

সম্পাদকের কথা	০৯
ভূমিকা	১২
তা'উজ বা 'আ'য়ুজু বিল্লাহি' পাঠ করার গুরুত্ব	১৩
তা'উজ পাঠ করার ফাযিলাত	১৪
যেই সকল স্থানে "তা'উজ" পাঠ করতে হয়	১৮
সূরহ মুহাম্মাদ, মাদানী	২৯
নামকরণ	২৯
নাযিলের সময় কাল	৩০
ঐতিহাসিক পটভূমি	৩০
তাসমিয়া	৩৩
"بِسْمِ اللهِ" এর ফাযিলাত	৩৪
মূল আলোচনা শুরু	
হক ও বাতিলের পরিচয় সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-১	৩৫
আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারীদের প্রকারভেদ	৩৭
১. শাসক	৩৭
২. শাসকের প্রশাসন	৩৮
শাসকের অর্থলোভী প্রশাসনের শেষ পরিনতি	৩৮
তগুত-ই-শাসকের প্রশাসনের সকল সৈনিককে ঢালাও ভাবে কাফের ফতুয়া দেয়া সঠিক নয়	৪০
৩. কলুষিত সমাজের প্রধানবর্গরা	৪১
৪. উলামায়ে সূ তথা পথভ্রষ্ট আলেম	৪৩
পথভ্রষ্ট আলেমদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস	৪৫
শায়েখ	৪৬
বড় বড় ইসলামী দলের নেতাগণ	৪৬
মুসলিম পাবলিক দল	৪৭
৫. স্বগোত্রীয় প্রধান	৪৮
সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-২	৫১

সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৩	৫৩
ইহুদি ধর্মের প্রধান উৎসব- ‘‘পাস ওভার’’	৫৪
ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যেভাবে	৫৫
খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসব- ‘‘ইস্টার সানডে’’	৫৭
বৌদ্ধ ধর্মের উৎসব- ‘‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’’	৫৮
হিন্দুধর্মের উৎসব- ‘‘অশ্লীল নাচ ও গান-বাজনা’’	৫৯
বাতিল হকের প্রতি অধিক যুলুম-নির্যাতন করলে ও হকের প্রতি সশস্ত্র আক্রমণ করলে হকের করণীয় সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৪	৬১
১. শিরক ও কুফরী	৬৪
২. বিদা’আত সৃষ্টি করা	৬৫
৩. ফাসেক রাষ্ট্রনেতা	৬৬
৪. বিলাসী ধনিক শ্রেণী	৬৬
৫. সুদ ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা	৬৭
৬. অন্যায় বিচার ব্যবস্থা	৬৮
৭. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বন্ধ হওয়া	৬৯
৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা	৬৯
যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে পদক্ষেপ	৭১
[১] ক্ষুদ্রঋণ	৭৩
[২] C.C. (ছিঃ ছিঃ) লোন বা ঋণ	৭৪
কাফির বন্দীদের ক্ষেত্রে আমীরুল মুজাহিদীনের ইচ্ছা	৮৩
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী মুজাহিদীনদের পক্ষে আল্লাহর বার্তা সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৫ ও ৬	৯০
জান্নাত	৯১
আল্লাহর সাহায্য মুজাহিদীনদের জন্য সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৭	৯৭
[১] মুমিন কাকে বলে?	৯৭
[২] আল্লাহকে সাহায্য করা	৯৮

[৩] আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া	১০০
[৪] আল্লাহর সাহায্যের পরিচয়	১০১
ইহকালের সাহায্য	১০১
পরকালের সাহায্য	১০২
কুফুরীর পরিণতি সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৮ ও ৯	১০৩
(১) বড় কুফরী	১০৪
(১.১) মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে গাল-মন্দ করা বড় কুফরী	১০৪
(১.২) মহান আল্লাহ তা'য়ালার রসূল (ﷺ) কে গাল-মন্দ করা বড় কুফরী	১০৫
(১.৩) মহান আল্লাহ তা'য়ালার আয়াতকে অস্বীকার করা বড় কুফরী	১০৬
(১.৪) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ অস্বীকার করা বড় কুফরী	১০৬
(১.৫) হালালকে হারাম করা আর হারামকে হালাল করা বড় কুফরী	১০৭
(১.৬) আল্লাহর ইবাদাতে শিরক করা বা অংশীদার স্থাপন করা বড় কুফরী	১০৭
(১.৭) আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরি করা, তাদেরকে ডাকা এবং তাদের নিকটে শাফায়াত কামনা বড় কুফরী	১০৮
(১.৮) মুশরিকদের কাফের মনে না করা। তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং তাদের মতবাদ সমূহকে সঠিক মনে করা বড় কুফরী	১০৯
(১.৯) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ মনে করা অথবা ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরি হুকুমাত উত্তম মনে করা বড় কুফরী	১১১
গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা	১১১
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা	১১২
শুরা ও গণতন্ত্রের পার্থক্য	১১৪
(১.১০) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ করা বড় কুফরী। যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে	১১৭

(১.১১) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনীত দ্বীনের কোনো বিষয় অথবা ইসলামের ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা বড় কুফরী	১১৭
(১.১২) যাদুর মাধ্যমে ভালো বা মন্দ কিছু অর্জন করা অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা বিচ্ছেদ ঘটাতে গোপনে বা প্রকাশ্যে তন্ত্র-মন্ত্র করা অথবা ছেলে মেয়ের সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বের ফাটল ধরাতে চাওয়া বড় কুফরী	১১৮
(১.১৩) মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা বড় কুফরী	১১৯
(১.১৪) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনীত শরিয়াত ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে জীবন পরিচালনা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে, এমন কথা মুখে উচ্চারণ করা বা অন্তরে বিশ্বাস করা বড় কুফরী	১১৯
(১.১৫) আল্লাহর রসূল (ﷺ) শেষ নাবী ও শেষ রসূল একথা বিশ্বাস না করা অথবা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর পরেও আরো কোনো নাবী বা রসূল আসবে বা আসছে একথা বিশ্বাস করা বড় কুফরী	১২০
(২) ছোট কুফরী	১২১
(২.১) মুসলমান-মুসলমান যুদ্ধ করা ছোট কুফরী	১২১
(২.২) আল্লাহর দেয়া রিযিক লাভের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা ছোট কুফরী	১২২
(২.৩) অন্যের বংশের প্রতি তাচ্ছিল্য করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিগণকে স্বরণ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা ছোট কুফরী	১২২
(২.৪) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা ছোট কুফরী	১২৩
(২.৫) পিতার পরিচয় অস্বীকার করা ছোট কুফরী	১২৩
(২.৬) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা অথবা গণকের নিকট যাওয়া ছোট কুফরী	১২৩
কুফুরীকারীদের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার সাবধান বাণী সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-১০ ও ১১	১২৫

সম্পাদকের কথা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা’আদ;

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ হাফিঃ এর লেখা আরেকটি বই ‘‘তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ’’। এই গ্রন্থটি লেখা শুরু ও শেষ করার ইতিহাস অনেকটাই লম্বা। যখন তিনি এ বিষয়ে লেখার চিন্তা নেন রাজশাহী কারাগারে থাকতে তখন ২০২২ সাল। অতঃপর তার কিছুদিনের মধ্যেই তার মামলার জামিনের সম্ভাবনাটি খুবই শক্তভাবে স্পষ্ট হয়। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক বাঁধা বিপত্তির পর তিনি ২০২২ সালে আগস্ট মাসে রাজশাহীর দেয়া মামলাটির জামিন পেয়ে যান।

আরো একটি মামলা থাকার কারণে রাজশাহী কারাগার থেকে তাকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর সেখান থেকে আবার পুরানো এক মামলা অর্থাৎ ২০১৯ সালের সন্ত্রাস বিরোধী মামলার জামিন নতুন করে করা হয় এবং ২০২২ ঈসায়ী সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ জামিনে তিনি বের হন। আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর, তাঁর দাওয়াহ এর কাজকে আবারো সক্রিয় করতে কয়েক মাস সময় পার হয়ে যায় এবং ২০২৩ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে ‘‘সূরহ মুহাম্মাদ’’ এর ব্যাখ্যা বা তরজমা গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন, যার নামকরণ করেছিলেন ‘‘তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ’’।

অতঃপর সূরহ মুহাম্মাদ এর ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘‘কাফির বন্দীদের ক্ষেত্রে আমীরুল মুজাহিদীনের ইচ্ছা’’ শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন। অতঃপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঈমান-আমল হেফাজতের লক্ষ্যে তিনি হিজরত করেন এবং ২০২৩ ঈসায়ী সালের ১৪-ই আগস্ট আবারো গ্রেফতার হন। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহ তা’য়ালার শুকরিয়া আদায় করেন এজন্য যে, আল্লাহ তাকে আবারো ২০২৪ ঈসায়ী সালের মে মাসে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং তিনি জামিনে বের হন। আলহামদুলিল্লাহ।

অতঃপর, তিনি ২৪-শে ছাত্র আন্দোলনের সময় আবার পুলিশি হয়রানির শিকার হন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। পরিবেশ তাঁর জন্য এতটাই কঠিন হয়ে যায় যে, ২ আগস্ট রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি হতে লুকিয়ে বিশাল

মাঠে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং সূর্য উদয়ের পূর্বেই নিজ গ্রাম হতে লুকিয়ে পাবনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বাড়ি থেকে পালানো বা লুকানোর কারণ এই যে, গোয়েন্দা ও পুলিশ সেই দিন বিকেল থেকেই তাঁর বাড়ির আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা জানতো যে তিনি সেইদিন বাড়িতেই ছিলেন। কাজেই তারা তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করে।

তখন চলমান ছাত্র আন্দোলনের দুইটি পর্যায় ছিল।
[১] ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার বিরোধী আন্দোলন ও মিছিল মিটিং।
[২] আন্দোলনের এক পর্যায়ে জালিম সরকার ও তার বাহিনী কর্তৃক অসংখ্য নিরীহ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীর মৃত্যু।

ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু দাবীর মধ্যে দিয়ে। যেটা শেষ পর্যায়ে ১ দফা সরকার পদত্যাগ এর দাবীতে রূপান্তরিত হয়। তারা শুরু থেকেই এর জন্য মিছিল, গণআন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এর একটা পর্যায়ে তাগুত সরকারমহল ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রসহ আন্দোলনরত সাধারণ গণমানুষের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো এবং অসংখ্য মানুষ এতে হত্যার শিকার হতে লাগলো। তিনি প্রথম অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ-বিপক্ষ দুটোকেই অনর্থক মনে করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের এক পর্যায়ে যখন মানুষের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পরেছিল এবং জালিমের জুলুমের চূড়ান্ত পর্যায়ের রূপ নিয়েছিলো, তখন তিনি এই সংকটময় পরিস্থিতিতে জনমত একত্রিত করেন এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও তাদের সন্ত্রাসদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ কর্মসূচি পালন করেন।

অতঃপর শেখ হাসিনার পতনের পর তাঁর দাওয়াহ এর কাজকে আরো শক্তিশালী ও সক্রিয় করতে বেশ কিছু মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি ২০২৫ ঈসায়ী সালের নভেম্বর মাস হতে আবারো "সূরহ মুহাম্মাদ" এর ব্যাখ্যা বা তরজমা এর বাকি অংশ ‘‘আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী মুজাহিদীনদের পক্ষে আল্লাহর বার্তা’’ শিরোনাম হতে লেখা শুরু করেন। যা সম্মিলিতভাবে ১-১১ আয়াত একত্রিত করে প্রথম পর্ব হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটিতে তিনি সূরহ মুহাম্মাদ এর সরল অনুবাদ এর পাশাপাশি আয়াতের মর্মার্থ, ভাবার্থ ও সেই বিষয়ের উপর কুরআন-সুন্নাহ এর দলিল ভিত্তিক মুসলিমদের আল্লাহ কি করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কি করতে বারণ করতেছেন সেগুলো সুন্দর ভাবে সাজিয়ে লিখেছেন। এজন্য বিশেষ করে সূরহ মুহাম্মাদ কেই বাছাই করার অন্যতম কারণ হচ্ছে- বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের মাজলুম অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেওয়া, যা এই সূরহ এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মুসলিমদের সাথে ইসলামও যেভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত আর চারিদিকে বিদআত-কুসংস্কার, অপব্যাখ্যাকেই যেভাবে ইসলামের রীতি-নীতি হিসেবে চালানো হচ্ছে তা সম্পর্কে মুসলিমদেরকে অবগত করা ও কঠিনভাবে সতর্ক করা। এছাড়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যে- কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত বর্তমানের ইসলামের মধ্যে কোথায়, কারা ও কিভাবে বিকৃত সাধন করছে, কারা মুসলিমদের বিরোধিতা করছে, বাঁধা দিচ্ছে। আরো রয়েছে- সমাজে নামে মুসলিম ও প্রকৃত মুসলিমদের বিপরীতমুখী অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা। মুসলিমদের এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করার জন্যই এই বইয়ের প্রকাশ।

সূরহ মুহাম্মাদ এর আরেকটি নাম হচ্ছে 'সূরহ ক্বিতাল' অর্থাৎ যুদ্ধ। যখন চারিদিকে জুলুম দিয়ে ভরে যায়, ইসলামের আলো নিভু অবস্থায় চলে যায়, বাতিলদের অত্যাচার-নির্যাতন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, বিধর্মী কর্তৃক মুসলিমদের হত্যা ও সশস্ত্র আক্রমণ চলতে থাকে, ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"অতএব, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্ত ভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ কর, না হয় মুক্তিপণ আদায় কর। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয় (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ হয়)। এটাই বিধান।" (সূরহ মুহাম্মাদ, আ: ৪)

সম্পাদক
জিহাদুল ইসলাম

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি 'আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ। আমি আবারো প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। অতঃপর ''তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ''। এটা সূরহ মুহাম্মাদের সাধারণ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা আমি জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্তে পর্ব আকারে খুবই সহজ সরল ভাষাতে লেখার চেষ্টা করেছি। যার প্রথম পর্ব প্রকাশ করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

''তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ'' নামক সূরহ মুহাম্মাদের এই সাধারণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখার প্রতি আগ্রহী হই ২০২২ সালে। তখন আমি রাজশাহী কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিলাম। সেখানে আমার একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত অন্যতম ছিল।

অতঃপর নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের এক পর্যায়ে সূরহ মুহাম্মাদ এর ভাবার্থ আমাকে অনেক আগ্রহী করে তোলে এই সূরহ নিয়ে চিন্তা গবেষণার প্রতি। যদিও আমি ইতিপূর্বে অনেকবার সূরহ মুহাম্মাদ পাঠ করেছি। কিন্তু সেই দিনের সূরহ মুহাম্মাদ তিলাওয়াতটি আমার সামনে মুসলিমদের প্রতিরক্ষার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। ফলে তখনই আমি ভাবি যে, সূরহ মুহাম্মাদ এর ভাবার্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা করবো, ইংশাআল্লাহ।

অতঃপর, দীর্ঘ সময় কারাবন্দী থাকার পর জামিনে বের হই এবং বিভিন্ন বাঁধা-বিপত্তির পর অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ অনুযায়ী অত্র কিতাবটি লেখা শুরু করি। আমি আশা রাখি ''তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ'' কিতাবটি পড়ে পাঠকগণ উপকৃত হবেন, ইংশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই কুরআন মাজিদের সঠিক ভাবার্থ বুঝে পড়ার ও আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

অত্র কিতাবটিতে কোনো লেখায় বানান বা শব্দগত ভুল পাঠকগণের নজরে পড়লে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করিবেন।

নিবেদক
মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর
২৭/১২/২০২৫ ঈসায়ী

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"আ'য়ূ'জুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বো-নির রজীম।"

তা'উজ বা 'আ'য়ুজু বিল্লাহি' পাঠ করার গুরুত্ব

সম্মানিত পাঠক- কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত শুরুর সময় "তা'উজ বা আয়ূজু বিল্লাহ" পাঠ করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

"তোমরা কুরআন পাঠের সময় বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।" (সূরহ নাহল, আ: ৯৮)

- তা'উজ পাঠ করার পদ্ধতি :

(ক)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আ'য়ুজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বো-নির রজীম।

(খ)

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আ'য়ুজু বিল্লাহিস সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ শাইত্বো-নির রজীম।

(গ)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আ'য়ুজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বো-নির রজীমি ইন্নাল্লহা হুওয়াছ ছামী'য়ুল 'আলীম।

(ঘ)

اَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আসতায়ীজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বো-নির রজীম।

(তাফসীর ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড, পৃ: ৬৯)

তা'উজ পাঠ করার বিধান: আমি প্রথমেই বলেছি, কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের শুরুতে ''তা'উজ বা আয়ুজুবিল্লাহ'' পাঠ করা ওয়াজিব। যদিও বিদ্বানদের একটি অংশের মতে তা'উজ বা আয়ুজুবিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম আ'তা বিন রিবাহ (রহিঃ) এর মত এই যে- কুরআন পাঠের সময় ''আয়ুজুবিল্লাহ'' পাঠ করা ওয়াজিব; তা নামাজের মধ্যেই হোক বা নামাজের বাইরেই হোক।

ইমাম রাজি (রহিঃ) এরও একই মত। হযরত আ'তা (রহি:) বলেন- (ফাসতা'ইয) শব্দটি "আমর" বা নির্দেশসূচক ক্রিয়াপদ। আর আরবী ব্যাকারণ অনুযায়ী "আমর" অবশ্যকরণীয় কার্যের জন্যেই ব্যবহৃত হয়। ঠিক আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সদা সর্বদা এর উপর আমলও তা অবশ্যকরণীয় হওয়ার দলীল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৬৮)

আর মহান আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট বানী এই যে,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

''তোমরা কুরআন পাঠের সময় বিতারিত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো''। (সূরহ নাহল, আঃ ৯৮)

তা'উজ পাঠ করার ফাযিলাত

- মন্দ কাজ থেকে হেফাজাত ও শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা যায় : তা'উজ বা ফাযিলাত সম্পর্কে হাফিয ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন-

قال ابن كثير رحمه الله:

والاستعاذة قبل القراءة هي قول جمهور العلماء. لأن المقصود أن يكون القارئ في حفظ الله من وساوس الشيطان.

''আ'উযূবিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে পাঠক কুরআনুল হাকীম পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আজে-বাজে চিন্তা থেকে (মাহফুয) হেফাজাত থাকে এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে

যায়''। (তাফসিরে ইবনে কাসির, পারা ১৪, সূরহ নাহলের ৯৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, পৃ: ৫২৯)

- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ" فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ

হযরত সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এমন একটি দুআ জানি, যদি এ লোকটি পড়ে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে ''আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতান', আমি শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই''। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নাবী (ﷺ) বলেছেন- তুমি আল্লাহর নিকট শাইতান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি। (ছহিহ বুখারী, হা ৩২৮২)

- ছলাত আদায়ের সময় শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা যায় :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، الْعَلاَءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا". قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي

হযরত উসমান বিন আবুল আস (রাঃ) নাবী (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার নামাজ ও

কিরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার কিরাতে জটিলতা সৃষ্টি করে। তখন রসূল (ﷺ) বললেন- এ হচ্ছে শয়তান, যাকে ''খানযাব'' বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে আল্লাহর নিকট তিন বার আশ্রয় প্রার্থনা করবে (অর্থাৎ আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম পাঠ করবে) এবং বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে। উসমান (রাঃ) বলেন- এরপর থেকে আমি এমনটি করি। ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম, হা ২২০৩)

প্রিয় পাঠক, তা'উজু এর ফাজিলাত এমন ক্রমিকভাবে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। কেননা ইয়াক্বিনের সাথে 'তাউজ' পাঠ এমন একটি আমাল, যা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে মুকাবেলা করে শত্রুকে পরাস্ত করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'তাউজ' পাঠ এমন একটি অস্ত্র যা পাঠের মাধ্যমে অদৃশ্যমান স্পষ্ট ও প্রকাশ্য শত্রুকে ঘায়েল করা যায়।

পাঠক বন্ধু! শয়তান এমন একটি শত্রু যাকে মানুষ দেখতে পায় না। যুদ্ধের ময়দানেও শত্রুকে দেখতে পাওয়া যায়- শত্রু যতই যুদ্ধের সরঞ্জাম পরিহিত অবস্থায় উন্নতমানের অস্ত্র নিয়ে আসুক না কেন; মার্কিন, ইজরাইল, রুশ সৈন্যদের মতো সম্মুখ অস্ত্র যুদ্ধে দুর্বল আফগান মুজাহিদদের মতো তাদেরকেও পরাস্ত করা যায়।

কিন্তু শয়তান এমন একটি প্রকাশ্য শত্রু, যা শুধু অপ্রকাশ্য থেকেই মনে কুমন্ত্রণা দিয়েই যুদ্ধ করে যায়। আর জানেন তো বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

''শুধু বনের বাঘে খায়না,
মনের বাঘেও খায়''

অতএব, এমন প্রকাশ্য অদৃশ্য শত্রুকে অদৃশ্য শক্তির নিকটেই সমর্পন করতে হবে।

যেহেতু আমরা মানুষ, আমরা শয়তানকে দেখতে পাই না কিন্তু শয়তান আমাদেরকে দেখতে পায়। আর সেজন্যই শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। আর শয়তান আল্লাহকে দেখতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ শয়তানকে দেখতে পায়। কাজেই ঐ অভিশপ্ত শয়তানকে আল্লাহর নিকটেই সোপর্দ করতে হবে।

আর শয়তানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার একটিই হাতিয়ার, তা হলো ‘‘তা’উজ’’। যেমন আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

‘‘যা উত্তম তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত কর। তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর বল, হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর, হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই’’। (সূরহ মুমিনূন, আ: ৯৬-৯৮)

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

‘‘তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক’’। (সূরহ আরাফ, আঃ ১৯৯)

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

‘‘আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত’’। (সূরহ হা-মীম সাজদাহ, আঃ ৩৬)

অতএব, এমন ভাবে কুরআন মাজিদের যেখানেই শয়তানের ধোঁকার কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানেই শয়তানের সাথে যুদ্ধের কোন কৌশল আল্লাহ তা’য়ালা শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি তাকে আল্লাহর হাতেই উঠিয়ে দেওয়ার

কথা উল্লেখ হয়েছে তথা শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে অভিশপ্ত শাইতান হতে হিফাজাত করুন, আমীন।

যেই সকল স্থানে "তাউজ" পাঠ করতে হয়

যেই সকল কথা বা কাজকে শয়তানের ধোঁকা বলে স্পষ্ট হওয়া যাবে এমন সকল কথা বা কাজেই তাউজ পাঠ করতে হবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"। (সূরহ হা-মীম সাজদাহ, আ: ৩৬)

অতএব, শয়তানের ধোঁকার বর্ণনা করে যেমন শেষ নেই; ঠিক তেমনি তাউজ পাঠের নির্দিষ্ট সময়েরই বর্ণনা নেই। তবুও তাউজ পাঠের স্থানটি অতি সহজভাবে বুঝানোর জন্য তাউজ পাঠের কয়েকটি স্থান নিম্নে উল্লেখ করলাম।

- **স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে**

স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তাউজ পাঠ করতে হয়। যেমন-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ "

হযরত জাবির (রা.) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন- যদি তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহলে তিনবার বাম দিকে থুতু দেবে। আর তিন বার

শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে (অর্থাৎ তাউজ পাঠ ধরবে)। আর যে পাশে শুয়েছিল, তা পরিবর্তন করবে। (ছহিহ মুসলিম, ৫৭৯৭)

- **মন্দ রাগের সময়**

রাগ সাধারণ দু'ই প্রকার। ক) কল্যাণকর রাগ এবং খ) অকল্যাণকর রাগ।

[ক] কল্যাণকর রাগের প্রমাণ-

১। আল্লাহর বিধি-নিষেধ বিষয়ে :

حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ"

হযরত আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, একবার নাবী (ﷺ) আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে রাগে নাবী (ﷺ)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়িশাহ (রা:) বলেন, নাবী (ﷺ) লোকদের মধ্যে বললেনঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐসব লোকের যারা এসব ছবি অঙ্কন করে। (ছহিহ বুখারী, ৬১০৯)

মাসায়েল (১) : সম্মানিত পাঠক! অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ সহ আলেম-উলামাদেরকেও দেখা যায়, যারা ক্যামেরায় নিজ ইচ্ছাতেই ছবি (সেলফি) উঠায়, অনেকেই আবার তাদের পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে ছবি উঠায়। যা গোনাহের কাজ। আর আলেম উলামা সেই গোনাহের কাজকে জায়েয তথা হারামকে হালাল করার জন্য যুক্তিও পেশ করে থাকেন; যা আরো একটি গোনাহ। তাদের যুক্তি- হাদিছে ছবি অঙ্কনকে হারাম করা হয়েছে; ছবি উঠানোকে নয়। ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানো ও কলম দিয়ে ছবি অঙ্কন করা এক বিষয় নয়। অতএব, যারা ছবি কলম দিয়ে

আঁকায় তারাই উপরোক্ত হাদিসের বর্ণিত শাস্তির যোগ্য; যারা ক্যামেরার ছবি উঠায়, তারা নয়। -যা ভুল যুক্তি।

২। ছলাতে রোগী-বৃদ্ধাদের বিবেচনা না করে ছলাত দীর্ঘ করা :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ"

হযরত আবু মাসউদ (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, অমুক ব্যক্তি ''ছলাত'' দীর্ঘ করে। যে কারণে আমি ফজরের ছলাত থেকে পেছনে থাকি অর্থাৎ জামায়াতে ছলাত পড়তে পারিনা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে কোনো ওয়াজের মধ্যে সেদিনের চেয়ে অধিক রাগান্বিত হতে দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘৃণা সৃষ্টিকারী আছে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে ছলাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং শ্রমিক-মুজুরি লোক থাকে। (ছহিহ বুখারী, ৬১১০)

৩। মাসজিদ অপরিষ্কার করা :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ"

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একবার নাবী (ﷺ) ছলাত আদায় করেন। তখন তিনি মাসজিদের কিবলার দিকে নাকের শ্লেষ্মা

দেখতে পান। এরপর তিনি তা নিজ হাতে খুঁচিয়ে সাফ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ ছলাতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তার চেহারার সম্মুখে থাকেন। কাজেই ছলাতরত অবস্থায় কখনো সামনের দিকে নাকের শ্লেষ্মা ফেলবে না। (ছহিহ বুখারী, ৬১১১)

৪। অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করা :

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَضَبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে কতকগুলো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, যা তিনি অপছন্দ করেন। লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে লাগল, তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বলেন, আমাকে প্রশ্ন করো। তখন এক লোক দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার পিতা কে? তিনি বললেন- তোমার পিতা হুজাফা। এর পর আরেক জন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল, আমার পিতা কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা শায়বাহর আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমার (রাঃ) রসূল (ﷺ)-এর চেহারায় রাগের আলামাত দেখে বলেন, আমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। (ছহিহ বুখারী, ৭২৯১)

৫। নফল নিয়ে বাড়াবাড়ি করা :

وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ "

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা:) বলেন, একবার নাবী (ﷺ) খেজুরের পাতা দিয়ে অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরি করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ হুজরায় (রাতে নফল) ছলাত আদায় করতে লাগলেন। তখন একদল লোক- তাঁর খোঁজে এসে তাঁর সঙ্গে ছলাত আদায় করতে লাগলো। পরবর্তী রাতেও লোকজন সেখানে এসে হাজির হলো। কিন্তু আল্লাহর রসূল (ﷺ) দেরি করেন এবং তাদের দিকে বেরিয়ে এলেন না। তারা উচ্চ স্বরে আওয়াজ দিতে লাগলো এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বলেন, তোমরা যা করছো তাতে আমি ভয় করছি যে, এটি না তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা ঘরেই (নফল) ছলাত আদায় করবে। কারণ ফরজ ছাড়া অন্য ছলাত নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম। (ছহিহ বুখারী ৬১১৩)

৬। নাবীদের মর্যাদা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى

رُئِيَ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِيْ أَحُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একবার এক ইহুদি তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেওয়া হলো, যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বলল, না! সেই সত্তার কসম যিনি মূসা (আ:)-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারি শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বলেন, তুমি বলছ, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন, অথচ নাবী (ﷺ) আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন। তখন সে ইহুদি লোকটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে গেল। এবং বলল, হে আবুল কাসিম, নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকার আছে অর্থাৎ আমি একজন জিম্মি। অমুক ব্যক্তি কি কারণে আমার মুখে চড় মারল? তখন নাবী (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনসারী লোকটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন নাবী (ﷺ) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর নাবীদের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামাতের দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান ও জমিনের বাকি সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা (আ:) আরশ ধরে আছেন। আমি জানিনা তুর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুঁশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, নাকি আমার আগেই তাঁকে বেহুঁশি থেকে উঠানো হয়েছে? (ছহিহ বুখারী ৩৪১৪)

৭) জায়েজ বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা :

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً"

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) একটি কাজকে জায়েজ করলেন, অন্য কিছু লোক তা খারাপ মনে করল। একথা নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি রেগে গেলেন! এমনকি তাঁর চেহারায় রাগ প্রকাশ পেল। তখন তিনি বলেন, লোকদের কী হলো যে, আমার জন্য বৈধ একটা কাজে তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে না। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে বেশি ভয় করি। (ছহিহ মুসলিম, ৬০০৫)

৮) উমার রাঃ কর্তৃক অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাগ করা: একদিন উমার রাঃ মহানবী (ﷺ) এর সাহাবীদের বললেন, যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন-

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶۶﴾

তোমাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আঙুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, আর বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করবে এবং তার জন্য থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে গেল? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরহ বাকারহ, আ: ২৬৬)

তারা বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রেগে বললেন, 'বলুন, আমরা জানি অথবা আমরা জানি না।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন, এই ব্যাপারে আমার কিছু ধারণা আছে বলে মনে হচ্ছে।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ভাতিজা, বলো এবং নিজেকে ছোট করো না।' ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটা হচ্ছে কিছু কাজের উপমা।' উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন কাজ?' ইবনে আব্বাস বললেন, 'কিছু কাজ।' তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটা হচ্ছে একজন ধনী ব্যক্তির উপমা, যে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য খুব চেষ্টা করত। আল্লাহ তারপর তার কাছে শয়তানকে পাঠালেন। তার সব ভালো আমল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে পাপে লিপ্ত ছিল। অন্য বর্ণনা অনুসারে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'এখানে কৃতকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদম সন্তানের বয়স হয়ে গেলে দুনিয়াতে সন্তান-সন্ততি ভরা সংসারের প্রয়োজন বোধ করে। আর আদম সন্তানকে যখন পুনরুত্থিত করা হবে তখন সে নেক আমলের প্রয়োজন বোধ করবে।' উমর বললেন, 'তুমি সঠিক কথাই বলেছ, ভাতিজা। (জীবন ও কর্ম, উমার ইবনুল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১.২.৮ পরিচ্ছেদ -ড. আলী সাল্লাবী, মাকতাবাতুল ফুরকান; আল খিলাফা আর রাশিদা ওয়া আদ-দাওলা আল-উমাউয়িয়া, ড. ইয়াহিয়া আল-ইয়াহিয়া, পৃষ্ঠা ৩০৫)

৯) ভুল সংশোধন ও সতর্ক করানোর জন্য রাগ প্রকাশ:

إِنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ. قَالَ: فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ! وفي رواية: فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا فَطَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشُقَّةٌ فِي الأَرْضِ! فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ، وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كان يَقُولُ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

وَالدَّابَّةِ". ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ

আবু হাস্সান আল-আ'রাজ নামক তাবিয়ী বলেন: "দুই ব্যক্তি আয়েশা (রা) -এর কাছে গমন করে বলেন: আবু হুরাইরা (রা) বলছেন যে, নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: নারী, পশু বা বাহন ও বাড়ি-ঘরের মধ্যে অযাত্রা ও অশুভত্ব আছে। একথা শুনে আয়েশা (রা) এত বেশি রাগন্বিত হন যে, মনে হলো তাঁর দেহ ক্রোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলেন: আবুল কাসিম (ﷺ)-এর উপর যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর কসম, তিনি এভাবে বলতেন না। নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলতেন: "জাহিলিয়্যাতের যুগের মানুষেরা বলত: নারী, বাড়ি ও পশু বা বাহনে অশুভত্ব আছে। এরপর আয়েশা (রা) কুরআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেন: "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ ৬/১৫০, পৃষ্ঠাঃ ২৪৬; এখানে আয়েশা (রা) আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনা গ্রহণ করেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনেছেন এবং কুরআনের যে আয়াত পাঠ করেছেন তার আলোকে এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।)

অতএব, উম্মাতের কল্যাণের অথবা ছাত্রের কল্যাণের অথবা অনুসারীদের কল্যাণের জন্য শারীয়াতসম্মত রাগ বৈধ। তথা যেই সকল রাগ দ্বারা হারাম কাজ সংঘটিত হয়না, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার হয় না সেই সকল রাগ বৈধ।

[খ] অকল্যাণকর রাগ-

যেই রাগ দ্বারা অশ্লীল বাক্য ব্যবহার হয়, হারাম কাজ সংঘটিত হয়, সেই রাগটিই হলো- অকল্যাণকর রাগ। এই রাগ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিছ-

حدثني يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر ـ هو ابن عياش ـ عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال "لا تغضب". فردد مرارا، قال "لا تغضب"

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) কে বললেন, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন- ‘‘তুমি রাগ করোনা’’। ঐ ব্যক্তি কয়েকবার তা বললেন, নাবী (ﷺ) প্রতিবারই বললেন- ‘‘রাগ করোনা’’। (ছহিহ বুখারী, ৫৬৮৬)

অন্য এক বর্ণনায়-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ"

নাবী (ﷺ) একবার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা অধিক শক্তিশালী মনে করো’’? তাঁরা উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে। নাবী করীম (ﷺ) বললেন- ‘‘সে প্রকৃত বীর নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় এবং সে-ই প্রকৃত বীর যে, ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়’’। (ছহিহ বুখারী, ৫৬৮৪)

উপরে উল্লেখিত হারাম রাগের সময় তাউজ পাঠ করতে হবে।

- **মনের মধ্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে**

অভিশপ্ত শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে তাউজ পাঠ করতে হয়। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾

‘‘আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে ধোঁকায় ফেলে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত’’। (সূরহ হা-মীম সাজদাহ, আঃ ৩৬)

- **ছলাতে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে**

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، الْعَلاَءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَىَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَا تْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي

হযরত উসমান বিন আবুল আস (রাঃ) নাবী (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার নামাজ ও কিরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার কিরাতে জটিলতা সৃষ্টি করে। তখন রসূল (ﷺ) বললেন- এ হচ্ছে শয়তান, যাকে ‘‘খানযাব’’ বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে অল্লাহর নিকট তিন বার আশ্রয় প্রার্থনা করবে (অর্থাৎ আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম পাঠ করবে) এবং বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে। উসমান (রাঃ) বলেন- এরপর থেকে আমি এমনটি করি। ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম, হা ২২০৩)

- **কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের শুরুতে**

মহান আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট বানী এই যে,

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۹۸﴾

‘‘তোমরা কুরআন পাঠের সময় বিতারিত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো’’। (সূরহ নাহল, আঃ ৯৮)

سورة অর্থাৎ সূরহ যার অর্থ পৃথকীকরণ ও উচ্চতা। যেহেতু কুরআন মাজিদের এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে স্থানান্তর হয় বা পৃথক-ভাবে পরিবর্তন করা হয়, তাই তাকে সূরহ বা পৃথকীকরণ বলা হয়।

প্রিয় পাঠক প্রায় সকল তাফসীরেই সূরহ শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে; কাজেই অত্র কিতাবে সূরহ এর বিস্তারিত আলোচনা না করে খুবই সংক্ষেপে সূরহ এর অর্থ তুলে ধরলাম। এই কিতাবটিতে সূরহ এর মতো যতগুলো বিষয় আসবে, যা অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত দেওয়া আছে এবং তা নিয়ে মতবিরোধ নেই। এমন প্রায় সকল বিষয়কেই সংক্ষেপে উল্লেখ করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

"সূরহ মুহাম্মাদ, মাদানী"

[সূরহটির আয়াত সংখ্যা ৩৮, রুকু ৪
এটি কুরআন মাজিদ এর ৪৭ নং সূরহ]

▪ নামকরণ :

এই সূরহটির দুই নং আয়াতের "وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ" অর্থ- "এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য"। অর্থাৎ সুরহ মুহাম্মাদের ২নং আয়াতের মধ্যমাংশের "مُحَمَّدٍ" শব্দটিকে নামকরণ করা হয়েছে। যার অর্থ আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

সূরহ টিকে আবার "সূরহ আল-ক্বিতাল" ও বলা হয়। যা অত্র সূরহ এর ২০ নং আয়াতের- "فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ"। অর্থ- "অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে সশস্ত্র যুদ্ধের উল্লেখ থাকে", অর্থাৎ অত্র আয়াতের "الْقِتَالُ" (কিতাল) অর্থ "সশস্ত্র যুদ্ধ" শব্দটিকে নামকরণ করা হয়েছে।

এটা এজন্য যে, মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর এতটাই যুলুম নির্যাতন, নির্মম অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে প্রিয় মক্কার ঘর-বাড়ি জনপদ ছেঁড়ে মুসলমানকে মাদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। আর এই হিজরত এতটাই প্রাণব্যাথার বিষয় ছিলো যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত নিম্নের হাদিছ টি দ্বারাই বুঝা যায়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ "وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ"

তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- হে মাক্কা নগরী! জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার

কাছে প্রিয়। যদি মাক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছায় আনন্দে কখনোও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। (তিরমিযী ৩৯২৫)

অতএব, যখন মনে অতি কষ্ট নিয়ে মক্কার মতো এত উত্তম জনপদ ত্যাগ করে অপরিচিত মাদিনাতে গেলেন, তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল জালিম, অত্যাচারী, কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে অত্র সূরহটির মাধ্যমে "সশস্ত্র যুদ্ধের'' শিক্ষা দিলেন। নির্যাতিত মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিলেন- ঐ সকল স্বৈরাচার, জালিম কাফের-মুশরিক ও তাদের অনুসারীদের আল্লাহর জমীনে নেতৃত্বের আসনে বসে থাকতে দেওয়া তো দূরের কথা তাদেরকে গ্রাম অঞ্চলের তথা মাতব্বর/প্রামাণিক পদেও রাখা যাবে না। আর এটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করে তাদেরকে অপসরণ করা যাবে না, কুরআন হাদিছের ছহিহ তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে অপসারণ করা যাবে না। যিকির করে যিকিরের তাজাল্লিতে তাদের অন্তর পরিষ্কার করে তাদেরকে অপসারণ করা যাবে না; এমন কি জায়নামাজ-তসবিহ, লাঠি-ইট-পাটকেল দিয়ে মিছিল-মিটিং করেও তাদেরকে অপসারণ করা যাবে না। তাদেরকে অপসারণ করার একটিই মাধ্যম, তা হলো- ''কিতা-ল বা সশস্ত্র যুদ্ধ'' আর অত্র সূরহ টিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই শিক্ষাই মুসলিমদেরকে দিয়েছেন। যে কারণে অত্র সূরহটির ২য় নামটি হলো "কিতা-ল বা সশস্ত্র যুদ্ধ"

▪ নাযিলের সময় কাল :

সূরহটির বিষয় বস্তু সাক্ষ্য দেয় যে, সূরহটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মাদিনায় নাযিল হয়েছিল, যখন সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশ হয়েছিল, কিন্তু তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি।

▪ ঐতিহাসিক পটভূমি :

সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহিঃ) তাঁর 'তাফসিরে তাফহিমুল কুরআনে' সূরহ মুহাম্মাদ এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে উল্লেখ করেন- যে

সময়ে এ সূরহটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বিশেষ করে মক্কা নগরীতে এবং সাধারণ ভাবে গোটা আরব ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে জুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানানো হয়েছিল। এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছিল।

মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে মাদিনার নিরাপদ স্থানে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এখানেও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। মাদিনার ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক থেকেই কাফেরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য মাত্র দুটি পথই খোলা ছিল। হয় তারা দ্বীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই শুধু নয় বরং আনুগত্য ও অনুসরণ পরিত্যাগ করে জাহিলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নয়তো জীবন বাজি রেখে প্রাণপণে লড়াই তথা সশস্ত্রযুদ্ধ করবে এবং চিরদিনের জন্য এ বিষয়ের ফায়সালা করে দিবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে? নাকি জাহিলিয়াত থাকবে? এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে দৃঢ় সংকল্পের পথ দেখিয়েছেন যেটি ঈমানদারদের একমাত্র পথ। আর তা হলো মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿۳۹﴾

'সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম' (সূরহ হাজ্ব, আ: ৩৯)।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে মুসলমানদেরকে সশস্ত্রযুদ্ধের অনুমতি দেন, তারপর সূরহ বাকারহ এর ১৯০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾

'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না'।

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কিন্তু সে সময় সবাই জানতো যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অর্থ কি?

মাদিনার ঈমানদারদের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল যার যুদ্ধ করার মতো পুরো এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধাও সংগ্রহ করার সামর্থও ছিল না। অথচ তাদেরকেই তরবারি নিয়ে সমগ্র আরবের জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাছাড়া যে জনপদে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন শত শত মুহাজির এখনো পুরোপুরি পুনর্বাসিত হতে পারেনি, আরবের অধিবাসীরা চারদিক থেকে আর্থিক বয়কটের মাধ্যমে যার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অভুক্ত থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও যার পক্ষে কঠিন ছিল এখন তাকেই লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

অতএব, যুদ্ধের পরিবেশ যেমনই হোক না কেন, মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের নিয়ম শেখার মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। এটিই সূরহ মুহাম্মাদ এর ঐতিহাসিক পটভূমি। আর হয়েছেও তাই।

তাসমিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

তথা- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

প্রিয় পাঠক! যেহেতু "بِسْمِ اللهِ" এর তাফসির প্রায় সকল তাফসির গ্রন্থেই একই রকমভাবে করা হয়েছে। কাজেই আমি সরাসরি বিসমিল্লাহ এর সংক্ষেপে আলোচনা শুরু করছি।

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিঃ) বলেন-

قال الإمام ابن كثير رحمه الله :وقد أجمع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في سورة النمل، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون قراءة كتاب الله ببسم الله الرحمن الرحيم.

সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদকে তিলাওয়াত করা "بِسْمِ اللهِ" দ্বারাই শুরু করেছেন। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরহ নামল এর এটা একটি আয়াত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আন-নামল (২৭), আয়াত ৩০-এর তাফসীর)

তবে 'বিসমিল্লাহ' সূরহ তাওবা বা বারাআত ব্যতীত প্রত্যেক সূরহকে এক সূরহ হতে অন্য সূরহকে পৃথক করার একটি আয়াত।

সুনানে আবু দাউদে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে-

قَالَ فَتَيْبَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এক সূরহকে অন্য সূরহ হতে অনায়াসে পৃথক করতে পারতেন না। (সুনান আবূ দাউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ৭৮৮)

"بِسْمِ اللّٰهِ" এর ফাযিলাত

ইমাম ইবনে কাসির (রহি:) বলেন- তাফসীর-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত উসমান বিন আফফান (রা:) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বিসমিল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এতো আল্লাহ তা'য়ালার নাম। আল্লাহর বড় নাম এবং বিসমিল্লাহ এর মধ্যে এতদূর নৈকট্য রয়েছে যেমন রয়েছে চক্ষুর কালো অংশ ও সাদা অংশের মধ্যে।

ইবনে মরদুওয়াই এর তাফসীরে রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার মতো আয়াত হররত সুলাইমান ছাড়া অন্য কোন নাবীর উপর নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি হলো- "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم"।

হযরত জাবির (রা:) বর্ণনা করেন যে, যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন পূর্ব দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, বায়ুমন্ডলী স্তব্দ হয়ে যায়, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত হয়ে উঠে, জন্তুগুলো কান লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে, আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তানকে তাড়াতে থাকে এবং বিশ্ব প্রতিপালক স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলতে বলেন- যে (হালাল) জিনিসের উপর আমার এ নাম নেওয়া যাবে, তাতে অবশ্যই বরকত হবে।

وقال ابن مسعود :من أراد أن ينجو من الزبانية التسعة عشر فليقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ فإنها تسعة عشر حرفًا، يجعل اللهُ كلَّ حرفٍ منها جُنَّةً من كلِّ واحدٍ منهم.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের ১৯ টি দারোগার হাত থেকে যে বাঁচতে চায়, সে যেন "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم" পাঠ করে।
এতেও রয়েছে ১৯টি অক্ষরের সমাবেশ। প্রত্যেকটি অক্ষর প্রত্যেক ফেরেস্তার জন্য রক্ষক হিসেবে কাজ করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসির, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৮)

মূল আলোচনা শুরু

হক ও বাতিলের পরিচয়

▪ আয়াত-১

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

যারা কুফুরী[১] করেছে এবং আল্লাহর পথে[২] বাঁধা দান করেছে[৩], তিনি তাদের সকল আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আলোচনা :

উল্লেখিত আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির সবচেয়ে বড় দুটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন- মানবজাতির বড় ক্ষতি দুটি হলো- ১। আল্লাহর সাথে কুফরী করা, ২। আল্লাহর পথে বাঁধা দান করা।

এখানে ক্ষতির দুই বিষয় প্রায় একই। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তথা কুফরী করে, তারাই আল্লাহর পথে মানুষকে বাঁধা দান করে; আর যারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাঁধা দান করে, তারাও আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণেই আল্লাহর পথে বাঁধা দান করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾

তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর তথা ইসলাম (আল্লাহর পথ)-কে নিভিয়ে (বাঁধা) দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সূরহ ছফ, আ: ৮)

টিকা-১: কুফরী তথা যারা কালিমাতুত তাওহীদ ও কালিমাতুর রিসালাহ, এই দুই কালিমার যেকোন একটি অথবা উভয় কালিমাকে কর্ম দ্বারা, মুখে প্রকাশ দ্বারা অথবা অন্তর দ্বারা অবিশ্বাস, অস্বীকার, অস্বীকৃতি অথবা অমান্য করে এবং যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম বিশ্বাস করে। এবং যে মুহাম্মাদ ﷺ কে শেষ নাবী ও রসূল মনে করে না সেও কাফের।

টিকা-২: আল্লাহর পথ তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ।

টিকা-৩: যেকোন ভাবেই সশস্ত্র জিহাদে বাঁধাদান।

যদিও কুফরী এবং আল্লাহর পথে বাঁধা দান একই বিষয়, তবুও স্বল্প জ্ঞানের মানুষদেরকে বুঝানোর জন্য যে (দুইটি বিষয়ে ক্ষতি একই রকম) একই আয়াতে দুইটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (আল্লাহু আলীম)

এই স্বল্প জ্ঞানের মানুষ বলতে আমি মুসলমানদেরই একটি অংশকে বুঝিয়েছি যদিও অন্যান্য তাফসীরকারকগণ আয়াতের ব্যাখ্যার তৎকালীন সময়ের ইহুদী-খ্রিষ্টান এবং কুরাইশ কাফেরদেরকে বুঝিয়েছেন। আমিও তাদের মতের সঙ্গে একমত।

তবে যেহেতু কুরআন মাজিদ শুধু তৎকালীন যুগের মানুষের জন্যই নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেহেতু সকল যুগের মানুষের জন্যই তা উপযোগী। এ থেকে বাদ যাবেনা বর্তমান আধুনিক যুগও, কেননা কুরআন মাজিদ আধুনিক যুগের কাছে পরাজিত নয়; বরং কুরআন মাজিদ-ই শ্রেষ্ঠ আধুনিক। তবে বর্তমান যুগের আধুনিকতা নামের জাহিলিয়াতকে ধ্বংস করার শিক্ষা দিতেও পিছিয়ে নেই আল-কুরআন।

যেহেতু নাবী (ﷺ) এর যুগের জাহিলিয়াতই বর্তমান যুগের আধুনিকতা; সেহেতু এই আধুনিক যুগের কাফের ও আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারী মানুষের অবস্থাও হবে ভিন্ন। কিন্তু কুরআন মাজিদ তাদেরকে চিনিয়ে দিতে অক্ষম নয়; তাই তো কুরআন মাজিদ কাফের ও আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারীদেরকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন যেন আমরা আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী ও কাফের বলতে শুধু কুরাইশ কাফের ও ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরই না চিনি। কারণ বর্তমান আধুনিক যুগে অনেক নামধারী মুসলিমও ‘‘আল্লাহর পথে’’ বাঁধা দান করে যাচ্ছে।

আর যেহেতু কুরআন মাজিদ অতীত, বর্তমান, ভবিষতের জন্য সেহেতু সূরহ মুহাম্মাদের অত্র আয়াতটিও বর্তমান যুগের কাফির ও আল্লাহর পথে বাঁধা দান কারীদের জন্য।

আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারীদের প্রকারভেদ :

আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী নামধারী মুসলিম প্রধানত ৫ প্রকার।

১. শাসক

ইসলামী শাসক তথা আমীরুল মুসলিমীন ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল শাসকই ইসলামী শক্তির বিপরীত শক্তি হিসেবে কাজ করে যায়। আর তা হয়- শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকার কারণে।

যেহেতু সেই শক্তি ইসলামী শক্তির বিপরীত বাতিল তথা ত্বগুতি শক্তি হিসেবে কাজ করে, সেহেতু তাদের অন্তরে সকল সময়েই এই ভয়টা থেকে যায় যে, ইসলাম বাতিল বা তগুতি শক্তিকে ধ্বংস করে, ইসলামী শক্তিকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তাই যেই শাসক পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা জমিনে প্রতিষ্ঠিত না রাখবে, সেই শাসক মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তথা তার উপর মহলের নেতাদের চাপে আল্লাহর পথের একনিষ্ঠ মুজাহিদদের জেল-জরিমানা, গুম-খুন, গ্রেফতার ইত্যাদি ভাবে বাঁধা দিবে, প্রকৃত ইসলামের তাৎপর্য রাষ্ট্রে প্রচার করতে দিবে না, জিহাদের কথা বলতে দিবে না, জিহাদ বিশ্বাসকারী মুসলিমদের একত্রিত হতে দিবে না, যে করেই হোক জিহাদ বিশ্বাসী মুসলিমদেরকে নানা দলে বিভক্ত করে দিবে। যার দলিল-

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

নিশ্চয় ফিরআউন (মিশর) দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম। (সূরহ কাছাছ, আ: ৪)

২. শাসকের প্রশাসন

শাসক জন্মসূত্রে কাফির, মুশরিক না হয়েও যদি নামধারী মুসলিম হয়, আর সে যদি মানুষকে আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়, তথা জিহাদের পথে বাঁধা দেয় সেই শাসকের প্রশাসনও ঠিক সেই শাসকের মতোই আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী হয়ে যায়, কারণ সেই প্রশাসনের সৈনিকগণ হয়ে থাকে চাটুকার ও অতি অর্থলোভী। কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম কখনোই সেই ইসলাম বিদ্বেষী শাসকের অধীনে প্রশাসন হয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক হবে না। কেননা বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তি সেই শাসকের প্রশাসনে চাকরি শুরু করার পূর্বে অন্তত এই কথাটি ভাববে যে, এই শাসক ইসলাম বিদ্বেষী, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর বিধান তথা তগুতি বিধান দিয়ে দেশ পরিচালনা করে, তগুতকে জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে। প্রয়োজনে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুমিন-মুজাহিদদের প্রতি খুন, গুম, গ্রেফতার ও নির্মম নির্যাতন চালায় আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

"যারা ঈমান এনেছে; তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল"। (সূরহ নিসা, আ: ৭৬)

অতএব সেই ব্যক্তি ভাববে, আমি একজন ঈমানদার ব্যক্তি হয়ে, কিভাবে আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদদের সাথে লড়াই করি ও তাদেরকে জঙ্গি বলি? আর তাগুতকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করি? কাজেই এমন শাসকের অধীনে প্রশাসনের চাকরি করার চেয়ে অনেক উন্নত ও সম্মানের পেশা হবে আল্লাহর বিধান মেনে সি.এন.জি এর ড্রাইভার হয়ে জীবিকা অর্জন করা।

শাসকের অর্থলোভী প্রশাসনের শেষ পরিনতি :

অনেকেই ভাবতে পারেন ইসলাম বিদ্বেষী শাসকের অধীনে চাকরী করে, তাদের তো আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকার কথা, দুনিয়াতে অর্থের অভাব,

সংসারের অশান্তি, মানসিক অসুস্থতা, শারীরিক অবনতি তো তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হবার কথা। কারণ, তারা ভালো-মন্দের বাছ-বিচার না করেই ইসলাম বিদ্বেষী শাসকের আদেশ মেনে কত অসহায়-নির্দোষ মানুষদেরকে জেলবন্দী করছে, ইসলাম প্রেমী আলেম ও তলবে ইলেমদের প্রতি লাঠিচার্জ করছে, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকে আসা অর্থের লোভে পড়ে নিরস্ত্র ইসলামী খিলাফাত প্রত্যাশী মুসলিমদেরকে গ্রেফতার করে গুমে রেখে নির্যাতন করছে, জঙ্গি নাটক সাজিয়ে জঙ্গি মামলায় জেলে দিয়ে বছরের পর বছর জেলবন্দী করে রাখছে; এই সকল নিষ্ঠুর লোভী মানুষদের প্রতি রয়েছে অসংখ্য মাজলুম মুসলিমদের অভিশাপ।

হ্যাঁ, সম্মানিত ভাবুক!

আপনার ভাবনাটাও ঠিক রয়েছে। সেই সকল নিষ্ঠুর অর্থলোভী মানুষগুলোও যে আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে তা নয়। বরং তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করছে; আপনার আশে পাশেই একটু ভালোভাবে দৃষ্টি ঘুরালেই দেখতে পাবেন। আর তাদের শেষ পরিণতির দলীল-

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে (তথা দুনিয়াতে) যা করে, তা বরবাদ হয়ে যাবে। আর তারা যা করতো তা সম্পূর্ণ বাতিল। (সূরহ হূদ, আ: ১৫-১৬)

অতএব ঐসকল অর্থলোভীরা দুনিয়ার বুকে যত সৎকাজই করুক না কেন সব সৎ কাজের প্রতিদানই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাদের পরিণাম হবে জাহান্নামের আগুন।

তগুত-ই-শাসকের প্রশাসনের সকল সৈনিককে ঢালাও ভাবে কাফের ফতুয়া দেয়া সঠিক নয়:

সম্মানিত পাঠক, কুরআন মাজীদ এর সূরহ নিসার ৭৬ নং আয়াতের-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۷۶﴾

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তগুতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।"

এই নির্দেশ দেখে প্রথমেই কাউকে ঢালাওভাবে কাফের বলা সঠিক নয়। কেননা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহি:) বলেন-

قد تكون الجماعة أو الطائفة في حكم الكفر، ومع ذلك يكون فيها بعض المؤمنين .وقد تكون الجماعة أو الطائفة في حكم الإيمان، ومع ذلك يكون فيها بعض الكافرين أو المنافقين.

একটি সম্প্রদায় বা দল দলগত ভাবে কাফের হলেও সেই দলের মধ্যে কিছু মুমিন ব্যক্তি থাকতে পারে, আবার একটি সম্প্রদায় বা দল দলগত ভাবে মুমিন হলেও সেই দলের মধ্যে কিছু কাফের ব্যক্তি থাকতে পারে (ফাতহুল বারী)। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহি:)-এর উপরোক্ত মতে-ই আমি একমত।

কেননা তগুত-ই-শাসকের প্রশাসন সম্প্রদায় বিধানগত কাফের হলেও তাদের মধ্যে অনেক সৈনিককেই দেখা যায়, যারা রাতে তাহাজ্জুতের ছলাত আদায় করে আল্লাহর নিকট কান্না-কাটি করে তাদের গোনাহ মাফের জন্য, তাদের অনেকেই সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করে, কাফেরকে কাফের আর তগুতকে তগুত বলেই বিশ্বাস করে; তারাও চায়, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। তারাও গোপনে গোপনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের মুজাহিদদের সাহায্য করে কিন্তু কোন না কোন ওজরবশত তারা সেই তগুতের অধীনেই চাকুরি করে। তবে অবশ্যই তাদেরকে ব্যক্তি

হিসেবে একজন মুমিন হিসেবেই গণ্য করতে হবে। আবার দেখা যায় অনেক ইসলামী বড় বড় দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই তগুতকে তগুত হিসেবে স্বীকার করে না। আবার তগুতকে তগুত জানলেও তগুতের ভয়ে তগুতের তাবেদারী করে তগুতের কাছেই বিচারপ্রার্থী হয়। এদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে, তবুও তারা তগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হয়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে" (সূরহ নিসা, আ: ৬০)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"অতএব তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়"। (সূরহ নিসা, আ: ৬৫)

৩. কলুষিত সমাজের প্রধানবর্গরা

আল্লাহর পথে বাঁধা দানের ক্ষেত্রে কলুষিত সমাজের প্রধানবর্গরাও এগিয়ে আছে একধাপ। যাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানের কিছুমাত্রও নেই তারাই সমাজে বসে আছে সমাজ প্রধান হয়ে। যারা ইসলাম বোঝেনা, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা কি তা বোঝে না, যাদের মুখের বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ মানুষের নিকট অসহনীয়। মুখের অশ্লীল ভাষা যাদের নেতৃত্ব দেয়ার অন্যতম পুঁজি। গায়ের জোর, মুখের জোর, অর্থের জোর আর লাঠির

জোরেই তারা সমাজ পরিচালনা করে; ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান তারা রাখেও না, রাখার চেষ্টাও করে না। এমন সমাজ প্রধানদের সমাজে যখন কোন তাওহীদ অনুধাবনকারী, তগুত বর্জনকারী, জিহাদ বিশ্বাসকারী মুমিন ব্যক্তি বসবাস করে, তাওহীদকে সঠিক ভাবে সমাজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, তগুত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদেরকে সর্তক করার তাবলীগ করে, তখনই সেই সকল সমাজ প্রধানরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদেরকে জঙ্গি বলে ঠাট্টা-মশকরা করে।

সুযোগ পেলে তাদের প্রতি নির্যাতন করতেও পিছপা হয় না। আর সেই জিহাদ বিশ্বাসী মুমিনকে যখন তগুত শাসকের প্রশাসন জেলবন্দী করে, তখন তো সেই সমাজ প্রধানদের খুশির শেষ থাকে না, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অলী হিসেবে উপস্থাপন করলেই যেন হয় যে, তারা যাকে এতদিন জঙ্গি বলে কল্পনা করেছে, আজকে প্রশাসন তাকেই ঠিক জঙ্গি মামলায় গ্রেফতার করেছে। এই সকল মূর্খ-জাহেল সমাজ প্রধানরা এতটুকুও ভাবেনা যে, তগুতি শাসকের প্রশাসন যেই ব্যক্তিটাকে গ্রেফতার করেছে, ঠিক সেই ব্যক্তিটিই ছিলো সমাজের উন্নত স্বভাবের ব্যক্তি। বরং ঐসকল মূর্খ সমাজ প্রধানরা আবার সমাজে সেই মুমিন ব্যক্তির নামেই সমালোচনা শুরু করে; চা-ষ্টলে চা-ষ্টলে তারা গড়ে তুলে জাতীয় সংসদ, মুদির দোকান আর ডাক্তারের দোকান হয় তাদের টকশোর মূল কেন্দ্র।

সেই মুমিন ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের জীবন যেন তারা দুর্বিষহ করে তোলে। আর ঐসকল মূর্খ সমাজ প্রধানদের কথার শব্দ দূষণে অর্থলোভী প্রশাসন এবং তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অনেক অচেনা মুখও বলতে থাকে- 'তাদের দোষ না থাকলে প্রশাসন গ্রেফতার করলো কেন? সে এতোই মুমিন ব্যক্তি তো সমাজ প্রধানরা তাদের খারাপ বলে কেন? জঙ্গি বলে কেন? মুমিন ব্যক্তিরা তো আরো নিজ পরিবার ও সমাজের লোকের নিকটেই ভালো হবে; আর সে এমনই মুমিন যে, তার গ্রামের লোকেরাই তাকে খারাপ ও জঙ্গি বলে'।

অতএব, প্রিয় পাঠক!

ঐসকল লোকের এমন যুক্তিমূলক কথা শুনে মোমের মতো গলে গেলেই হবে না, কুরআন-সুন্নাহর সাথেও তাদের কথার মিল দেখতে হবে। সমাজে এক শ্রেণীর পীর ও ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচারণাকারী মুনাফিক ব্যতীত কেউই সমাজের মানুষের নিকট ভালো ও সৎ ব্যক্তি হয়ে থাকতে পারেনি। এমন কি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কেও তৎকালীন সমাজ প্রধানরা সম্পূর্ণ ভালো ব্যক্তি বলে নাই। বরং তারা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে নির্যাতন করেছে।

দারুল হুদা কুতুবখানা প্রকাশনীর ''আর রাহীকুল মাখতুম'' এর ১৫৮ পৃষ্ঠার ''রসূলে কারীম (ﷺ) এর ওপর যুলুম-নির্যাতন শুরু'' শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠের বুকে ইসলামের দাওয়াতের যেদিন সর্বপ্রথম উদ্বোধন হয়েছিল, সেদিন থেকে শুরু করে কুরাইশরা তাদের মনে রসূলে কারীম (ﷺ) এর প্রতি যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা লালন করত এখন তো তা হিংসা আর বিদ্বেষের অনলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আত্মম্ভরী আর দাম্ভিক এ সকল ঘাড়ত্যাড়াদের জন্য এখন আর এক মুহূর্তও বসে থেকে সেই দ্বীনের বিস্তৃতি আর বিজয়ের দৃশ্য দেখা সহ্য হচ্ছিল না। এতদিন পর্যন্ত এ পথে তাদের হাতিয়ার ছিল রসূলে কারীম (ﷺ) এর বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-মশকরা আর খেল-তামাশা। এগুলো এখন মজাহীন ও পুরনো খেলায় রূপ নিয়েছিল। এবার তারা হাত বাড়ালো রসূলে কারীম (ﷺ)-এর উপর যুলুম-নির্যাতনের।

সম্মানিত পাঠক, আমি উপরে শুধুমাত্র কিছু সারাংশ উল্লেখ করলাম। রসূল (ﷺ) এর নামে সমালোচনা, যুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য প্রতিটি সিরাত গ্রন্থেই আপনি পাবেন। একটু কষ্ট করে, ধৈর্য ধরে সিরাতগুলো পাঠ করলেই বাস্তবতার মিল পেয়ে যাবেন। ইংশা আল্লাহ।

৪. উলামায়ে সূ তথা পথভ্রষ্ট আলেম

আল্লাহর পথে বাঁধা দানের ক্ষেত্রে তগুতি শাসক, অর্থলোভী প্রশাসন আর মূর্খ সমাজ প্রধানদের থেকে কোন ভাবেই পিছিয়ে নেই ভণ্ড আলেমরা।

যারা শুধু দামী টুপি, দামী আতর, আর লম্বা জুব্বা পরে বসেই থাকে না, বরং তারা যুগে যুগেই ত্বগুতি শাসক, জালিম শাসক, স্বৈরাশাসকের পক্ষ নিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াও প্রদান করে যায় অবিরত। তাদের মুখের উক্তিই হলো- জিহাদ নেই, বর্তমানে জিহাদের সঠিক সময় নয়, জিহাদ করতে শাসকের অনুমতি লাগে, যদিও সে ত্বগুতি শাসক হয়; নাবীর যুগের জিহাদ আর এই যুগের জিহাদ এক নয়। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়া বোকামী, মুসলিমরা নির্যাতিত হলে তাদের জন্য শুধু দোয়া করতে পারি, কিন্তু জিহাদের প্রস্তুতি সন্ত্রাসের শামিল ইত্যাদি।

এই সকল উক্তি দ্বারা তারা তাদের ত্বগুতি শাসককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে, যাতে তাদের প্রতি দুনিয়ার কোন বালা-মুসিবাত না আসে, শাসকের পক্ষ থেকে জেল-জরিমানা না হয়। কোন বাঁধা ছাড়াই মাসজিদে ইমামতি করে, মাদরাসায় শিক্ষকতা করে, মাহফিলে ওয়াজ করে নিজেদের নাদুস-নুদুস ভুড়িটা পরিপূর্ণ করা যায়, অর্থের ঘ্রাণ প্রতিনিয়তই নাকে নেয়া যায়। ঐ সকল ভন্ড আলেমদের ব্যাপারে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ:) বলেন-

"তোমরা দুনিয়ার জন্য কাজ করছো অথচ এখানে কাজ ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে তোমরা পরকালের জন্য কাজ করছ না, অথচ সেখানে কাজ ছাড়া কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না। ওহে ভন্ড আলেমের দল, ধ্বংস তোমাদের! তোমরা বিনিময় গ্রহণ করছো এবং আমল বরবাদ করছো, অথচ দুনিয়া থেকে বেরিয়ে কবরের অন্ধকার ও তার সংকীর্ণতায় তোমাদের ঢোকার সময় অত্যাসন্ন। আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে তোমাদেরকে ছলাত ও ছিয়ামের আদেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে পাপ কাজ করতেও তো তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে কেমন করে আলেম হয় যার কাছে পরকালের তুলনায় দুনিয়া বেশি অগ্রাধিকার পায়, যার আসক্তি দুনিয়ার প্রতিই বেশি? সে কেমন করে আলেম হয় যার যাত্রাপথ পরকালের দিকে অথচ মুখ দুনিয়ার দিকে এবং যার কাছে কল্যাণকর বস্তুর তুলনায় ক্ষতিকর বস্তু অধিক লোভনীয়? সে কেমন করে আলেম হয় যে তার রিযিককে অপছন্দ করে এবং পদমর্যাদাকে তুচ্ছ মনে করে, অথচ সে জানে

এ সবকিছুই আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান-ক্ষমতার অধীনেই? সে কেমন করে আলেম হয় যে তার বিপদ-মুসিবতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালাকে দোষারোপ করে? সে কেমন করে আলেম হয়, যে কথা শিখে নিছক বাগ্মিতা যাহির করার জন্য, আমল করার জন্য নয়?" (রসূলের চোখে দুনিয়া, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিঃ, পৃ ১৮৮, হা ৪১২)

পথভ্রষ্ট আলেমদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْعُلَمَاءَ الْمُضِلِّينَ"

হযরত আবু যার গিফারী (রা:) বলেছেন, "আমি নাবী (ﷺ) এর নিকট একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মাহ্ এর জন্য দাজ্জালের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটি কোন জিনিস, যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মাহ এর জন্য দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করেন? তিনি বললেন, পথভ্রষ্ট আলেমগণ"। (মুসনাদে আহমাদ ৫/১৪৫, হা ২০৩৩৫)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা:) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাহ এর জন্য কোন কিছুরই ভয় পাই না, পথভ্রষ্ট আলেমগণ ব্যতীত। এভাবে যখন আমার উম্মাহ এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠানো হবে, এটা তুলে নেওয়া হবেনা বিচার দিবস পর্যন্ত। (মুসনাদে আহমাদ ১৬৪৯৩, ২১৩৬০, ৩১৩৫৯, ২০৩৩৪; আদ-দারিমী ২১১, ২১৬)

অতএব ঐ সকল পথভ্রষ্ট ভণ্ড আলেমরা সকল সময়েই জিহাদের বিপক্ষে অবস্থান করে, তারা তাদের লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহর পথে বাঁধা দান করে। আর ঐ সকল পথভ্রষ্ট আলেমরা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন লেবাস

ধারণ করে বসবাস করছে। যেমন- পীর, ফকির; তারা মহল্লায় মহল্লায় মুরিদ করে বেড়ায়, আর মুরিদানদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখার জন্য জিহাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়, যথাঃ নফসের জিহাদ বড় জিহাদ, অস্ত্র নিয়ে জিহাদ হলো সন্ত্রাসী; এখন বুলেট জিহাদ নয়, ব্যালট জিহাদ অর্থাৎ কিতালের জিহাদ এখন বাতিল হয়েছে, ভোটের জিহাদ এখন চলমান। (নাউজুবিল্লাহ)

শায়েখ:

ঐসকল শায়েখগণ এসি রুমে বসে বিভিন্ন সময়ে তাদের অনুসারীদের মাঝে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়ে যায়, জিহাদের বিপক্ষে বিভিন্ন কিতাব লেখালেখি করে থাকে। এদের কথা আবার মানুষ একটু বেশি গ্রহণ করে, এই জন্য যে তারা প্রায় সকল কথাই ছহীহ হাদিছ দিয়ে বলে। যেহেতু তারা প্রায় সকল বিষয়েই সহীহ হাদিছ বলে থাকে, সেহেতু বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ নেই, তাদের এই কথাটিও সঠিক।

অথচ সাধারণ মুসলমান এই কথাটি ভাবে না যে, জিহাদ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখার জন্য তারা শুধু ছহীহ শব্দটিকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া কখনোই কোন ভাবেই ইসলামের কোন কাজই ছহীহ হতে পারে না। যেহেতু সশস্ত্র জিহাদ অস্বীকারকারীদের ইসলাম পালনই ছহীহ না, সেহেতু তাদের অন্য সকল বিষয়ের ছহীহ দিয়ে কি কল্যাণ হবে?

বড় বড় ইসলামী দলের নেতাগণ:

ঐসকল নেতাগণ সর্বস্থায় তাদের কর্মীদের মাঝে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন; এটাও একটি ফেতনা যে তারা জিহাদ স্বীকার করে, কিন্তু জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা গোপন রেখে ভুল ব্যাখ্যা তাদের কর্মীদের মাঝে প্রচার করে থাকে। কারণ তারা জিহাদ বলতে মিছিল-মিটিং, অবরোধ-হরতাল, লং মার্চ ইত্যাদিকে বুঝায়, আর কিতাল তথা সশস্ত্র জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে থাকে।

তাদের উক্তি-১: দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে শত বছর দেরি হলেও আমরা রক্তপাত করবো না।

উক্তি-২: আমরা জিহাদের নামে অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী করে জাতিসংঘের কাছে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত হতে চাই না ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে এই সকল আলেম নেতাগণও মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখে, তথা আল্লাহর পথে বাঁধাদান করে।

মুসলিম পাবলিক দল:

এটা মূলত কোন দলের নাম নয়, কিন্তু তারা তাদের কথা ও কাজ দিয়ে মানুষের নিকট দাবি করে তারা মুসলিম পাবলিক দল। তারা সশস্ত্র জিহাদকে সন্ত্রাস ও দুনিয়াবী ফেতনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আর জিহাদের অর্থ করে প্রচেষ্টা। যেহেতু তারা পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে মানুষের কাঁধে হাত বুলিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে। তাই সেই প্রচেষ্টার নামই হলো জিহাদ (নাউজুবিল্লাহ)। তাদের চেনার সংক্ষিপ্ত উপায় হলো- তারা এক মাসজিদ হতে আরেক মাসজিদ সফর করে বেড়ায়, তাওহিদ-রিসালাতের দাওয়াতের পরিবর্তে বিদাত-কুসংস্কারের দাওয়াত দিয়ে বেড়ায়, আর কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট আলোচনার পরিবর্তে বিদাতি কিতাব ফাযায়েলে আমলের তালিম করে। অথচ হাদিসে এক মাসজিদ হতে আরেক মাসজিদে সফর করার ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে। হাদিসে এসেছে-

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ"

হারূন ইবনু সাঈদ আল আয়লী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযীঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেবলমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেঃ কাবাহ মসজিদ, আমার এ মসজিদ (নববী) এবং ঈলিয়ার মাসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩২৫২, ইসলামীক সেন্টার ৩২৪৯)

অর্থাৎ, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদের জন্য সফরের উদ্দেশ্য করা নিষেধ। আর এই মুসলিম পাবলিক দল, মূলতঃ এরাও তাদের অনুসারীদেরকে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, আল্লাহর পথে বাঁধা দান করে থাকে।

৫. স্বগোত্রীয় প্রধান

স্বগোত্রীয় প্রধান তথা নিজ বংশের চাচা-দাদা যারা মাতব্বর ধরনের। এমন প্রধান বংশে দুই প্রকারের দেখা যায়-

[১] সারা বছর ভাই-ভাসতিদের কোন খোঁজ-খবর রাখে না। ভাই-ভাসতিদের দ্বারা অমনঃপূত কোন কিছু হলেই মাতব্বরি করতে আসে। ভাই-ভাসতির উপর এমন স্বগোত্রীয় প্রধানদের বর্তমান বাংলাদেশে অভাব নেই। এসকল মাতব্বররা নিজেদের ভাই-ভাসতিদের দেখ-ভাল করা তো দূরে থাক, বরং ভাই-ভাসতি একটু দুর্বল হলে, ইসলাম পালনকারী হলে সেই ভাই-ভাসতির জমির উপরেই জবরদখল দিয়ে থাকে, কথায় কথায় তাদের উপর অভিভাবক সেজে উপদেশ দিতে থাকে। সমাজে এমন স্বগোত্রীয় মাতব্বর চাচা-দাদারাই নিকৃষ্ট।

[২] স্বগোত্রীয় এমন মাতব্বর চাচা-দাদা, যারা ভাই-ভাসতিদের দেখা-ভাল করে, নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখে, ভাই-ভাসতি কোনরূপ দুনিয়াবী বিপদে পড়লেই পাশে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু ভাই-ভাসতি ইসলাম পালনকারী হলে তখন তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করে, তাদেরকে বয়কট করে, তারা বলে থাকে- তোদের এতো দেখা-শোনার পরেও কেন জঙ্গি দলে যোগ দিলি; এমন জঙ্গি ভাতিজা বা জঙ্গি ভাইকে আমি বয়কট করি। এমন চাচা-দাদা মাতব্বর সাধারণত আরবেই অধিক দেখা যেত। এমন গোত্রীয় প্রধান চাচা ইসলাম পালনের অপরাধে ভাতিজাদের প্রতি কঠিন নির্যাতন করে থাকে। উদাহরণ- আল্লাহর নাবী (ﷺ) এর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ যুল-বিজাদাইন (রা:), যাকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তার চাচা তার পরিধানের পোশাক পর্যন্ত খুলে রেখেছিল।

আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী প্রধান ৫ প্রকার লোকদের কথা উল্লেখ করলাম, যারা কাফির-মুশরিক না, বরং নামধারী মুসলিম। আর কাফির-মুশরিকরা তো আল্লাহর পথে প্রধান বাঁধা দানকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই।

উপরে উল্লেখিত আল্লাহর পথে বাঁধা দানকারী ৫ প্রকার লোক ছাড়াও আরো কিছু ব্যক্তি বা বস্তু রয়েছে যারা মুমিন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর পথে বাঁধা দান করে থাকে। কুরআন মাজিদে সেই সকল বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছো এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরহ তওবা, আ: ২৩-২৪)

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দু' শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন-

১। ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মগ্রহণকারী- কাফের।

২। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র জিহাদকে বাঁধা প্রদানকারী।

আর এই দুইশ্রেণীর লোকদের পরিণাম সম্পর্কেও অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো কাফেররা যতই দান-সদকা করুক, মেহমানদের আপ্যায়ন করুক, অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিক এবং নামধারী মুসলিম যারা আল্লাহর পথে তথা সশস্ত্র জিহাদের পথে বাঁধা দান করে, সশস্ত্র জিহাদের বিরোধিতা করে, তারা যতই নামাজ আদায় করুক, রমাদান মাসে ছিয়াম পালন করুক, দান-সদকা করুক, হজ্ব করুক, তাহাজ্জুত আদায় করুক কোনোই লাভ নেই। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত দুই শ্রেণীর লোকদের সকল সৎকাজের নেকি বা সওয়াবকেই ধ্বংস বা বাতিল করে দিবেন। কাজেই তাদের এই সকল সৎ আমল আখিরাতে তাদের কোন কাজেই আসবে না।

▪ আয়াত-২

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দিবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।

আলোচনা :

অত্র সূরাটির ১নং আয়াতে ইসলাম বিরোধী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা যতই ভালো কাজ করুক না কেন, কুফরী করার জন্য ও আল্লাহর পথে তথা সশস্ত্র জিহাদের কাজে বাঁধা দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকল ভালো কাজের বিনিময়ই ধ্বংস বা বাতিল করে দিয়েছেন। আর ২নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন, মুমিন সেই ব্যক্তিকে বলা হয়- যেই ব্যক্তি কালিমাতুত তাওহীদ ও কালিমাতুর রিসালাহ মুখে উচ্চারণ করেছে, অন্তরে বিশ্বাস করেছে এবং তার আমল নিজের উপর বাস্তবায়ন করেছে।

মুমিনদের গুণ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে- তারা সৎ কাজ করে তথা তারা নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত ফরজ ছলাত আদায় করে, পাশা-পাশি সুন্নাত ও নফল ছলাতের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থের নিসাব পূর্ণ হলে সূক্ষ্ম হিসাব করে ৮টি খাতে যথার্থ ভাবে যাকাত প্রদান করে। ফল-ফসলের যাকাত সঠিক ভাবে আদায় করে, রমাদ্বান মাসে ছিয়াম পালন করে, মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, সামর্থ অনুযায়ী দান করে, জিহাদের জন্য প্রচেষ্টা করে, অনাহারীকে আহার দেয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয় ইত্যাদি। মুমিন ব্যক্তিদের আরো একটা বড় গুণ হলো- তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তথা কুরআন ও হাদিস নির্দ্বিধায় কোনরূপ

সন্দেহ ছাড়া মেনে নেয় এবং সেই অনুযায়ীই আমল করে। কারণ তারা কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করে যে, কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদিস, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সত্য প্রেরিত।

কাজেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের উত্তম গুণগুলো দেখে খুশি বা সন্তুষ্টি হয়ে তাদের জন্য দুটি পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন-

[১] মুমিনদের অনেক মন্দ কাজ আছে বা থাকবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই ছোট-খাটো মন্দ কাজের দিকে না তাকিয়ে তাদের সকল মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দিবেন। আবার মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দেওয়ার অর্থ এও হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেসকল মন্দ কর্ম বা ইসলাম বিরোধী কর্মগুলো সংঘটিত হয়েছে, ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সেই সকল মন্দ কর্মগুলো আল্লাহ তা'য়ালা মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে ইতিহাসে স্বরণীয়-বরণীয় করে রাখেন যার উদাহরণ- আমীরুল মুমিনিন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে হত্যা করতে চেয়েছিলেন; অথচ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মুমিনদের নেতা। (সুবহান আল্লাহ)

[২] ইসলাম গ্রহণের ফলে আরবের তৎকালীন মুশরিকদেরকে যে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু ক্ষমা করে দিয়েছেন তা নয় বরং তাদের অবস্থার পরিবর্তনও করেছেন। আর তা হলো-
যেহেতু কাফির-মুশরিকরা স্থায়ী ভাবে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট সেহেতু তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের স্থায়ী ভাবে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট করেছেন (সুবহান আল্লাহ)। আর এটাই একটা মুমিন ব্যক্তির অবস্থায় বড় পরিবর্তন।

▪ আয়াত-৩

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

তা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

আলোচনা :

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেইসকল স্বল্প জ্ঞানের মানুষদেরকে বুঝিয়েছেন, যেইসকল মানুষ তাদের স্বল্প জ্ঞানের কারণে বলে থাকেন যে,

"আল্লাহ তা'য়ালা দুটি সম্প্রদায়ের সাথে দুই রকম ব্যবহার করলেন কেন? একটি সম্প্রদায়ের সকল ভালো কাজকে আল্লাহ তা'য়ালা ধ্বংস করে দিবেন? আবার অন্য একটি সম্প্রদায়ের সকল মন্দকাজকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদের অনুত্তম অবস্থা থেকে সংশোধন করে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাবেন।"

তাদের প্রশ্নের উত্তরেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন যে- তা এজন্য যে, যারা কুফরী করেছে তারা মূলত বাতিলের অনুসরণ করে, যেহেতু ঈমান ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই, সেহেতু তাদের কুফরীর কারণে তথা ঈমান না থাকার কারণে তাদের কল্যাণকর সকল কাজই বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। আর যারা ঈমানদার তারা মূলত হকের অনুসরণ করে, কাজেই তাদের পিছনের মন্দ কর্ম এবং সামনের ছোট-খাটো মন্দ কর্মগুলো আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করে দেন।

আর এই দুইটি সম্প্রদায়ের দুটি উদাহরণই মানুষের জন্য যথেষ্ঠ। এখন মানুষেরা তাদের নিজেদের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে, সেটাই যেন গ্রহণ করে। এটাই তাদের জন্য উপদেশ।

সম্মানিত পাঠক, মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন ভূমিকা ছাড়াই অত্র সূরার ১-৩নং আয়াতে মুমিন ও কাফিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কেননা তার পরের আয়াতসমূহে মুমিন ও কাফেরের সম্পর্ক কি হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকেই বলে থাকে ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম, অত্র সূরার ১-৩ নং আয়াত থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে ইসলাম অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নয় বরং সাম্প্রদায়িক। আর যারা ইসলামকে অসম্প্রদায়িক বলে উদারতা দেখাতে চায়, তারা মূলত পৃথিবী থেকে ইসলামকে চিরতরে উৎখাত করতে চায়। তাদের এই উদারতার আড়ালে লুকিয়ে আছে ইসলাম নিয়ে বড় এক ষড়যন্ত্র। তাইতো তারা মুসলিমদের মাঝে কুফরী আক্বিদা প্রবেশ করানোর চেষ্টায় বলে থাকে, ''ধর্ম যার যার উৎসব সবার'' (নাউজুবিল্লাহ)।

অথচ, বিধর্মীদের উৎসব ও মুসলিমদের উৎসব সম্পূর্ণই ভিন্ন উৎসব। একটু ভালো ভাবে মিলিয়ে দেখুন-

ইহুদি ধর্মের প্রধান উৎসব- ''পাস ওভার''

মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে ইহুদিদের মুক্তি পাওয়ার উপলক্ষে এই উৎসব। আট দিনের উৎসবের প্রথম সন্ধায় বিশেষ ভোজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ''হাগাদা'' থেকে ''পাস ওভার'' এর কাহিনী পাঠ করা হয়। এই ভোজের খাদ্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ''সাবাথ''।

ঈশ্বর বা আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব নির্মাণ করে সপ্তম দিন বিশ্রাম নিয়েছেন। এই বিশ্বাস থেকেই ইহুদি সম্প্রদায় প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত 'সাবাথ" পালন করে। ইহুদিদের কাছে ''সাবাথ'' বিশ্রামের সময়। সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি জ্বালানো, একসঙ্গে খাওয়া আর সিনাগগে গিয়ে প্রার্থনায় অংশ নেওয়া, এসব মিলেই ''সাবাথ'' উৎসব উদযাপন। (ইনসাইড

বাংলাদেশ (ইনসাইড আর্টিকেল) বিভিন্ন ধর্মের যত উৎসব ও পবিত্র দিন- নিজস্ব প্রতিবেদক, ৪ জুলাই ২০২০ ইং)

ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যেভাবে-

ইহুদিদের প্রধান উৎসব ‘‘পাসওভার’’ এর প্রধান সমস্যা হলো- আকিদা বা বিশ্বাসগত সমস্যা। কেননা ইহুদিদের পাস ওভার উৎসবটি শিক্ষা দেয়- আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ তা’য়ালা বিশ্রামে গেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

আর ইসলাম মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয়- আল্লাহর নিন্দ্রা বা তন্দ্রা আসে না, তাই আল্লাহ তা’য়ালার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না; যেমন আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। (সূরহ বাকারহ, আ: ২৫৫)

বিশ্রামের জন্য অবশ্যই ক্লান্তির প্রয়োজন; যার কোন ক্লান্তিই নেই, তিনি বিশ্রাম নিবেন কেন? তিনি তো বিশ্রামের মুখাপেক্ষী নয়। বরং আসমান জমিনের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾

‘‘আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী’’। (সূরহ ইখলাস, আ: ২)

আর কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা’য়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইহুদিদের আক্বিদা বা বিশ্বাস যে- আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে বিশ্রামে গেছেন। তা কুফরী; কারণ ঐ সকল কিছু সৃষ্টি করতে তার কোন ক্লান্তিই আসেনি, কাজেই তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّةِ اَیَّامٍ ۟ وَّمَا مَسَّنَا مِنۡ لُّغُوۡبٍ ﴿۳۸﴾

“আর অবশ্যই আমি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। আর আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি”। (সূরহ ক্বফ, আ: ৩৮)

আল্লাহ তা’য়ালার সিফাত নিয়ে ইহুদিদের মিথ্যাচার যে- আল্লাহর বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, আল্লাহ বিশ্রাম নেন। তাদের এই মিথ্যা কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ
مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর আরশে সমুন্নত রয়েছেন। তিনি (সেখান থেকে) সব কিছুই পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। তার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (সূরহ ইউনুস, আ: ৩)

ইসলামের সঙ্গে ইহুদিদের প্রধান উৎসব “পাস ওভার” এর আরো একটি সাংঘর্ষিক বিষয় সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালানো যা মুসলিমদের জন্য প্রত্যাখ্যাত।

এছাড়াও ইহুদিদের প্রধান উৎসব এর প্রধান কাজ “সাবাথ” যা মহান আল্লাহ তা’য়ালার আদেশ অমান্য করার শিক্ষা দেয়। সাবাথের কথা কুরআন মাজীদে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِیْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕیْنَ ﴿۶۵﴾

আর তোমাদের মধ্যে যারা সাবাথের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (সূরহ বাকারহ, আ: ৬৫)

কুরআন মাজীদে ‘আসহাবুস সাবাথ’ সম্পর্কে অনেক আলোচনা রয়েছে। আসহাবুস সাবাথ অর্থ শনিবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। (তাফসিরে তাবারী)

অনেক সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যান্য ইহুদিদেরকেও ভয় দেখিয়েছে এই বলে যে, তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)- কে গ্রহণ করে নাও তা ব্যতীত তোমাদেরকেও আসহাবুস সাবাথের মতো লা'নত করব। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾

হে কিতাবপ্রাপ্তপণ! তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন, আমি তোমাদের মুখমন্ডলকে বিকৃত করে তারপর পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে অথবা আসহাবুস সাবাথকে যেরূপ লানত করেছিলাম, সেরুপ তাদেরকে লা'নত করার আগে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (সূরহ নিসা, আ: ৪৭)

অতএব, প্রিয় মুসলিম। ভেবে দেখুন, যেই সাবাথ বর্গের উপর আল্লাহর লা'নত সেই সাবাথ উৎসব মুসলমদের জন্য কিভাবে হবে?

খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসব- "ইস্টার সানডে"

গুড ফ্রাইডের এক দিন পরের রবিবারটি "ইস্টার" হিসেবে পালিত হয়। মোটামুটি ভাবে ইহুদি ক্যালেন্ডারের "নিসান" মাসের চতুর্দশতম কিংবা পঞ্চদশতম দিন অথবা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ২২ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণের পর এই দিনই ঈসা মাসিহ রিসারেকশন বা পুনঃজীবন লাভের ঘটনাটি ঘটে বলে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস। (ইনসাইড বাংলাদেশ, অনলাইন পোর্টাল)

অতএব, বুঝতেই পারছেন ইসলাম মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয় ঈসা (আঃ) মারা যায়নি। বরং আল্লাহ তাকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আসমানে উঠিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۭ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًۢا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

“আর তারা অভিশাপ্ত হয়েছিল একথা বলার কারণে যে, আমরা মারিয়াম পুত্র ঈসা মাসিহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি। বরং তারা এরূপ বিভ্রম ও ধাঁধায় পতিত হয়েছে। যারা তাঁর সম্বন্ধে মত করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সংশয়যুক্ত ছিল, এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত হয় তারা তাঁকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরহ নিসা, আ: ১৫৭-১৫৮)

অতএব, ভেবে দেখুন! খ্রিষ্টানদের “ইস্টার সানডে” উৎসব পালনের মূল বিশ্বাস হলো- ঈসা (আ:) মারা গেছে এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। আর ইসলাম তা অস্বীকার করছে। ইসলাম বলছে- ঈসা (আ:) ক্রুশবিদ্ধও হয়নি, মারাও যায়নি বরং তিনি আল্লাহর নিকটে আছেন। কাজেই কোন মুসলিম যদি খ্রিষ্টানদের উৎসবকে নিজের উৎসব মনে করে সাথে সাথে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (নাউজুবিল্লাহ)

বৌদ্ধ ধর্মের উৎসব- “বুদ্ধ পূর্ণিমা”

বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের একটি অন্যতম অনুষ্ঠান হলো ভোরে স্নানের আগে বরুণ দেবকে প্রণাম করা এবং স্নান বা গোসলের পর মধুসূদনের পূজা করা অতঃপর রাতে চন্দ্র দেবের আরতি পূজা করা। (কৃষি জাগরণ, বুদ্ধপূর্ণিমা-২০২২: কখন এবং কি পদ্ধতিতে বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপন করবেন, জানুন এর ধর্মীর তাৎপর্য, ৯ই মে, ২০২২ইং বিকেল ৩:০২ মিঃ)

এখন ভেবে দেখুন বৌদ্ধধর্মের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমার প্রধান কাজই হলো মূর্তিপূজা করা আর ইসলামে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

"তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের জন্যে রিযিক এর মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরহ আনকাবুত, আ: ১৭)

হিন্দুধর্মের উৎসব- "অশ্লীল নাচ ও গান-বাজনা"

হিন্দুদের যে আজগুবি ধর্ম, এই ধর্ম অন্যান্য বাতিল ধর্ম সবগুলোকেই পিছ ফেলে দিয়েছে। তাদের ধর্মের পরতে পরতে শুধু মূর্তি পূজা আর মূর্তি পূজা। এই হিন্দু ধর্মের আর কোন্ উৎসবটির কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করবো? কোন উৎসবই তাদের নেই যা বিশেষ ভাবে এখানে আলোচনা করা যায়। তবে হ্যাঁ, তাদের একটি কর্ম, যা তাদের প্রত্যেক উৎসবেই প্রধান কর্ম হিসেবে উল্লেখযোগ্য। শুধু উৎসবে তা নয়; বরং উৎসবের বাহিরেও সেই কর্ম চলে। তা হলো- অশ্লীল নাচ ও গান বাজনা। যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপেই হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

আর হিন্দুদের প্রত্যেক দেব-দেবতা ও তাদের অনুসারী সকলেই শুধু নাচ-গানের পাগল। কোন যুবতি নারী অর্ধউলঙ্গ হয়ে নাচলেই ঠাকুরও খুশি, দেবতাও খুশি। (নাউজুবিল্লাহ)

আর মূর্তিপূজা সম্পর্কে ইসলামের কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে বলেন-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং মিথ্যা পরিহার করো। (সূরহ হাজ্ব, আ: ৩০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐসকল মুশরিক মূর্তি পূজকদের সম্পর্কে বলেন-

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآىِٕهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۵﴾ وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّ كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۶﴾

সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা

তাদের ডাক সমন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামাতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে। (সূরহ আহকাফ, আ: ৫-৬)

অতএব, চিন্তা করে দেখুন একজন মুসলিম কিভাবে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে মূর্তিপুজার দিকে ধাবিত হবে? আর যেই মুসলিম ধাবিত হবে সেতো মুসলিম না বরং টাটকা মুশরিক।

আর রইলো গান-বাজনা। গান-বাজনা সম্পর্কে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে, আল্লাহর রাস্তা (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত করার জন্য ''অসার কথা'' ক্রয় করে। (সূরহ লুকমান, আ: ৬)

আল্লাহর নাবী (ﷺ) এর ছাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) আল্লাহর কসম করে বলেছেন- উক্ত আয়াতে ''অসার কথা'' বলতে অনৈসলামিক গান বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬/৩৩৩; তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত, পৃ: ৭)

প্রিয় পাঠক! অত্র আলোচনা থেকে হয়তো বুঝতে পেরেছেন- ''ধর্ম যার যার উৎসব সবার'' এই কুফরী মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ মুসলিমদেরকে কাফের বানানো।
যখন মুসলিমরা বিধর্মীদের উৎসব গ্রহণ করবে, তাদের আচার-আচরণ গ্রহণ করবে, তখন মুসলিম সমাজ থেকে মুসলিম আদর্শ উঠে গিয়ে বিধর্মীদের আদর্শ সমাজে বাস্তবায়ন হবে। ফলে মুসলিমরা তাদের আদর্শ তথা রসূল (ﷺ) এর সুন্নাতকে ছেড়ে বিদাআতকে ধরবে এবং আল্লাহর তাওহীদকে ছেড়ে শিরকের মধ্যে পতিত হবে। তখন মুসলিমরা বুঝবে না কোনটা সুন্নাত আর কোনটা বিদআত, কোনটা তাওহীদ আর কোনটা শিরক। আর এটাই হবে মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস করে হিন্দুদের তথা মুশরিক সাম্রাজ্য গঠনের মোক্ষম সময়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বিধর্মীদের যাবতীয় উৎসব এবং নীতি থেকে হিফাজাত করুন। আমীন।

বাতিল হকের প্রতি অধিক যুলুম-নির্যাতন করলে ও হকের প্রতি সশস্ত্র আক্রমণ করলে হকের করণীয়

- **আয়াত-৪**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

অতএব, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্ত ভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ কর, না হয় মুক্তিপণ আদায় কর। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয় (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ হয়)। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনোই তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।

আলোচনা :

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাতিলের যুলুমের অবসান ঘটানোর শিক্ষা দিয়েছেন। হকের প্রতি বাতিলের যুলুম নির্যাতন এতটাই বৃদ্ধি পেয়ে গেছিল যে, পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা বাতিলের এই যুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটানোর একমাত্র পথকে বিধান হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আর তা হলো বাতিলের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ। বাতিলের অনুসারীদের অধিক হারে হত্যা, বাতিলের ঘাড়ে সজোরে তরবারীর আঘাত, যেন সে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। যদি তরবারীর যুদ্ধ না হয়ে বন্দুক যুদ্ধ হয়, তবে ঘাড় থেকে শুরু করে মাথায় গুলি করে মারার চেষ্টা করতে হবে। ঘাড়

থেকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করার শিক্ষা দেয়ার দুইটি কারণ থাকতে পারে।

(ক) ঘাড় বা মাথায় আঘাত করলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আবার দ্বিতীয়বার উঠে দাড়ানোর শক্তি পায় না। যেহেতু সে আল্লাহর দুশমন যতো তাড়াতাড়িই হোক তাকে আল্লাহর দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে দিতে হবে। এমন অপবিত্র-অকৃতজ্ঞ, অভিশপ্ত বান্দা আল্লাহর দুনিয়ায় থাকার অধিকার রাখে না অথবা সে যতক্ষণ দুনিয়াতে থাকবে, সে ততক্ষণই গুনাহ সংগ্রহই করতে থাকবে। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকবে, কাজেই এ অভিশপ্ত ব্যক্তিকে দুনিয়ায় রেখে সকল জীবের প্রতিই গজবপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় তাকে হত্যা করে জাহান্নামের দরজার নিকট পৌছে দেয়াই উত্তম। তাই তাকে হত্যার সময় তার তাড়াতাড়ি মৃত্যুর জন্য ঘাড়ে বা মাথায় আঘাত করে হত্যা করার কথা এসেছে।

(খ) যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা অতি দয়ালু, সেহেতু তাঁর বান্দা মুনাফিক হোক, কাফের হোক চায় মুশরিক; যেন সেই বান্দাকে হত্যার সময় কষ্ট দিয়ে হত্যা করা না হয়। অতএব তাকে ঘাড়ে আঘাত করো, যেন সে তাড়াতাড়ি মারা যায়। এটাও অত্র আয়াতের "ঘাড়ে আঘাত করো'' আদেশের উদ্দেশ্য হতে পারে। (আল্লাহ আলীম)

সুতরাং, অত্র আয়াতের আলোচনার সারাংশ হলো- যারা কাফের-মুশরিক-বাতিলের অনুসারী তাদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের সময় ঘাড়ে আঘাত করো যেন সে তাড়াতাড়ি জাহান্নামের দরজার নিকটে পৌছে যায়। আর ঘাড়ে আঘাত করে হত্যা করা তথা তাড়াতাড়ি যেন মারা যায় এমন ব্যবস্থা করার কারণ হতে পারে দুইটি-

(ক)

আল্লাহর দুশমন যতক্ষণ পৃথিবীতে থাকবে, ততক্ষণ তারা পাপের কারণে গজব আসলে আম মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে, সে কারণে তাকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে যাতে দ্রুত সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তি আম মানুষ থেকে অন্তরাল

হয়ে যায়। কিছু আল্লাহর দুশমনের অধিক পাপের কারণে আম মানুষও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।

✍ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে (কিছু) মানুষের কৃতকর্মের দরুন। এর দ্বারা আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (সরল পথে) ফিরে আসে। (সূরহ রুম, আ: ৪১)

✍ অপর হাদিসে বলা আছে-

إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

হযরত ক্বতাদাহ ইবনু রিবাঈ আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত। একবার রসূল (ﷺ) এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি বললেন- সে সুখী অথবা (অন্য লোকেরা) তার থেকে শান্তি লাভকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)? মুস্তারিহ ও মুস্তারাহ মিনহু এর অর্থ কি? তিনি বললেন- মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু শান্তিপ্রাপ্ত হয়। (ছহিহ বুখারী, হা ৬৫১২)

অতএব, আল্লাহর দুশমন সেইসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মানুষ যতক্ষণ দুনিয়াতে থাকে ততক্ষণই আম জনতার ক্ষতি।

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফিঃ) বলেন- সূরহ রুম এর ৪১ নং আয়াত আলোচনায় বিশৃঙ্খলা বা ফাসাদকেই আল্লাহর একটি গজব হিসেবে উল্লেখ করেন। (দারসে কুরআন, সূরহ রুম, আ: ৪১, মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই-২০০৯)

হযরত আবুল আলিয়াহ (রহি:) বলেন-

قال أبو العالية رحمه الله : من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة.

পৃথিবীতে যে কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা করে, সে বিশ্বে ফাসাদ সৃষ্টি করে অর্থাৎ গজবের কারণ হয়। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ নির্ভর করে আল্লাহর আনুগত্যের উপর। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১১ এর তাফসীর)

✍ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন। (সূরহ শূরা, আ: ৩০)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফিঃ) সাহেব এমন কিছু ব্যক্তিদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাদের কারণে পৃথিবীতে সাধারণ জনগণের উপরও গজব আসে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. শিরক ও কুফরী :

এটিই হলো প্রধানতম কারণ। পৃথিবীর শাসককুল এখন জনগণের নামে নিজেদেরকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে দাবী করছে এবং শাসন, বিচার ও আইন বিভাগের সর্বত্র আল্লাহর মালিকানায় নিজেদের শরীক বানাচ্ছে। এভাবে তারা স্বাধীন মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে। নিজেদের মনগড়া আইনের মাধ্যমে তারা আল্লাহ কৃত হারামকে হালাল করছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের সব গুনাহ মাফ করেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। (সূরহ নিসা, আ: ৪৮, ১১৬)

এমন কি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন। (সূরহ মায়েদা, আ: ৭২) প্রধানত এইসব রাষ্ট্র নেতাদের কারণেই পৃথিবীতে সর্বব্যাপী গজব ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. বিদা'আত সৃষ্টি করা :

ইহুদী-নাছারা আলেম ও দরবেশগণ তাদের ধর্মে বিদাআত সৃষ্টি করার কারণেই আল্লাহর নিকটে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত হয়েছে। (কুরতুবী, হা ২৪০)

এমনকি এদের একটি দল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে হীলা-বাহানা করে সিদ্ধ (হালাল) করায় আল্লাহর হুকুমে তারা বানর-শুকুরে পরিণত হয়েছে। (সূরহ বাকারাহ, আ: ৬৫)

আরেকটি দল সংসার ত্যাগের (রাহবানিয়াত) বিদাআত সৃষ্টি করে (সূরহ হাদীদ, আ: ২৭)। যা আজও তাদের মধ্যে আছে। যে কারণে তাদের পোপ-পাদরীরা চিরকুমার থাকে। তাদের ন্যায় মুসলিম ধর্মনেতাদের অনেকে ইসলামকে খেল তামাশার বস্তু বানিয়েছেন।

তারা নিজেদের বানোয়াট ধর্মীয় প্রথাসমূহ সমাজে চালু করেছেন এবং বিদাআতে হাসানাহ নাম দিয়ে হীলা-বাহানা করে চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মের নামে হটকারি এইসব লোকগুলোর উপরে আল্লাহ দারুন নাখোশ হন এবং এদের অনেকের তাওবার দরজা বন্ধ করে দেন।

যেমন হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায়-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদাআতীর তাওবাহ রোধ করে থাকেন"। (সিলসিলা ছহীহাহ, হা ১৬২০)

এজন্যই দেখা যায় অনেক চোর-গুন্ডারা তাওবা করলেও কট্টরপন্থী বিদাআতীরা তাওবা করে না। কারণ সে ধারণা করে যে, সে নেকীর কাজ

করছে। বস্তুতঃ এদের কারণেই দুনিয়াতে আল্লাহর গজব দ্রুত নেমে আসে।

৩. ফাসেক রাষ্ট্রনেতা :

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন-

إِذَا وُلِّيَ الأَمْرُ أَهْلُهُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পন করা হবে, তখন তোমরা কিয়ামাতের অপেক্ষায় থাক। (বুখারী, ৭১২৫)

তিনি আরো বলেন-

مَنْ وُلِّيَ قَوْمًا فَلَمْ يَرْعَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا رَائِحَةَ جَنَّتِي

আল্লাহ যাদেরকে জনগণের উপরে নেতৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর সে তাদের কল্যাণে যত্নবান হয়না, সেই ব্যক্তি আমার (নবী ﷺ) অন্তর্ভুক্ত নয়, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (মুসলিম, ১৮৫৬)

অন্য এক হাদিছে তিনি বলেন-

وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ»

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো প্রজা-সাধারণের উপর যুলুমকারী শাসক। (মিশকাত, হা ৩৬৮৮)

বস্তুতঃ রাষ্ট্রনেতাদের যুলুমের কারণেই সারা পৃথিবী আজ আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। যদিও তারা ফেরাউনের মত মুখে সর্বদা জনগণকে বলে যে, আমরা কেবল তোমাদের মঙ্গলের পথ দেখাই। (সূরহ মুমিন, আ: ২৯)

৪. বিলাসী ধনিক শ্রেণী :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিলাসী ধনিক শ্রেণীকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনপদের ওপর আমার

আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে দেই। (সূরহ বানী ইসরাইল, আ: ১৬) অতএব, ধনিক শ্রেণীর অধঃপতনই জনপদের অধঃপতন ডেকে আনে।

৫. সুদ ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। (সূরহ বাকারাহ, আ: ২৭৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ

সুদকে আল্লাহ সংকুচিত করেন ও ছদাকাকে প্রবৃদ্ধি করেন। (সূরহ বাকারাহ, আ: ২৭৬)

অর্থাৎ, সুদী মালামালকে আল্লাহ ধ্বংস করেন ও তার বরকত নষ্ট করেন।

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عاقبتَه تصيرُ إِلى قُلٍّ: رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন- সুদের অর্থ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার পরিণাম হলো- নিঃস্বতা। (মিশকাত, হা ২৮২৭, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

বর্তমানে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদের বিশ্বমন্দা অত্র হাদিছের বাস্তব প্রমান। বস্তুতঃ লাগামহীন ব্যক্তি মালিকানার ফলে সমাজের কিছু লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় ও বাকিরা নিঃস্ব হয়। যাকে বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। তার বিপরীতে ব্যক্তি মালিকানাহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ফলে রাষ্ট্রের কাছে সকল সম্পদ জমা হয় ও পুরো সমাজ নিঃস্ব হয়। যাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা বলা হয়। দুটিই মানুষের স্বভাববিরোধী ও চরমপন্থী অর্থনীতি হওয়ায় বিশ্ববাসী কোনটাই মেনে নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর তা হলো- মানুষের নিজের মেধা, সততা ও যোগ্যতার তারতম্যের কারণে অর্থনীতিতেও স্তরভেদ থাকবে। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তা লাগামহীন হবে

না। ইসলামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে। এর ফলে সমাজের সর্বত্র অর্থের প্রবাহ থাকবে। দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করবে। হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রা:) এর খিলাফাত কালে মাত্র ১০ বছরে আরব ভূখণ্ড থেকে দারিদ্র বিদায় নিয়েছিল এই অর্থনীতির বরকতে। আজও তা সম্ভব কিন্তু তা না থাকায় আল্লাহর গজব একটার পর একটা ক্রমাগত ভাবে নাযিল হচ্ছে।

৬. অন্যায় বিচার ব্যবস্থা :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

যুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত, হে জ্ঞানীগণ! (সূরহ বাকারহ, আ: ১৭৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে পাপী না করে এ ব্যাপারে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না করো। তোমরা ন্যায় বিচার করো। এটাই আল্লাহ ভীরুতার নিকটবর্তী। (সূরহ মায়েদাহ, আ: ৮)

বস্তুতঃ নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা, দলীয় আনুগত্য ও অন্যর প্রতি বিদ্বেষ মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। অথচ বিচারককে যাবতীয় অনুরাগ ও বিরাগের উর্ধ্বে থাকতে হয়। যা একমাত্র আল্লাহ ভীতি ব্যতীত সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত মানবীয় আইনে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যা অনেক সময় সমাজে অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়ক। অথচ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধান সমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে আল্লাহর গজব সমূহ ত্বরান্বিত হয়েছে।

৭. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বন্ধ হওয়া :

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لكم»

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন- ‘‘যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে। নইলে অচিরেই আল্লাহ তোমাদের উপর নিজের পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে মুক্তির জন্য দুআ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না’’। (মিশকাত, হা ৫১৪০)

তিনি আরো বলেন-

إِذا رَأَوُا الظَّالِم فَم يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

মানুষ যখন অন্যায় হতে দেখবে, অথচ তা প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না, সত্বর তাদের উপর ব্যাপকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেমে আসবে। (মিশকাত, হা ৫২৪২)

বস্তুতঃ মুসলমানের উত্থান ঘটানো হয়েছে উক্ত কাজের জন্য এবং এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি (خير أمة) বলেছেন (আলে ইমরান, আ: ১১০)। কিন্তু মুসলমান আজকাল তাদের এ দায়িত্ব যেন ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহর গজব ব্যাপকতা লাভ করেছে।

৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন- আমি আল্লাহ; আমি রহমান। রেহেম (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে আমার নাম হতে তৈরি করেছি। অতএব যে ব্যক্তি রক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ককে যুক্ত করবে, আমি তার সাথে আমার রহমাতের সম্পর্ক যুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (আল-আদাবুল মুফরাদ, ৫৩)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন- বিদ্রোহ করা ও রক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এতো জঘন্য নয় যে, দ্রুত আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেন এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন। (তিরমিজি ২৫১১; আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেন-

أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ أَقْرَبُهُمْ فَأَقْرَبُهُمْ فَأَقْرَبُهُمْ

সবচেয়ে নিকটবর্তী হলেন মা, অতঃপর পিতা, অতঃপর তুলনামূলক ভাবে অন্যরা। (তিরমিজি; হাকেম)

দুর্ভাগ্য, বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা আজকাল আমাদের পারিবারিক জীবনকে ভঙ্গুর করে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এখন স্বার্থদুষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজে দ্রুত আল্লাহর ক্রোধ নেমে এসেছে।

উপরে উল্লেখিত আট শ্রেণীর মানুষ যাদের কারণে দুনিয়ার সাধারণ জনগণের প্রতিও আল্লাহর গজব নাজিল হয় তাদের আলোচনা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফি:) সূরা রুমের ৪১নং আয়াতের দারসে কুরআন মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই, ২৩ইং-এ উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে আমি কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করলাম।

সম্মানিত পাঠক! এমন শ্রেণীর মানুষ আরো আছে যাদের কারণে সাধারণ জনগণও গজবের মধ্যে পতিত হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি শ্রেণীর লোক হলো যারা যাকাত প্রদানকে জরিমানা মনে করে যা তিরমিযি ও মিশকাতে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে ৪৭০ নং হাদিছে উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ মানুষই যাকাতকে জরিমানা মনে করে। যখনই তাদের নিকট যাকাতের কথা উপস্থাপন করা হয় তখনই তারা বিভিন্ন কথা বলে যাকাতের বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার অনেকেই বলে- 'আমি তো যাকাত যা আসবে, তার চেয়ে বেশিই দান করে ফেলি'। মূলত এই সকল কথাগুলো যাকাত অস্বীকার করার নব্য পাঁয়তারা। তাদেরকে যদি বলা হয়- যাকাত বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আবার অর্থ-সম্পদের হিসাব করে যদি যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়, তবে সেই অর্থ-সম্পদের সম্পূর্ণ যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থ শতকরা (২.৫০) আড়াই টাকা, ফসল প্রতি মণে ২ কেজি অথবা ৪ কেজি। এর বেশিও ইসলাম নেবে না, এর কমও ইসলাম গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ আপনি আপনার অর্থ-সম্পদের সঠিক হিসাব করুন। তখন তারা যাকাতকে মনে করে এটা তার প্রতি জরিমানা।

তখন তারা যাকাত আদায় না করার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, যা মূলত যাকাতকে অস্বীকার করার শামিল। আর যাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হয়রত আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে পদক্ষেপ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর (রাঃ) খলিফা হলেন তখন আরবদের কিছু লোক (যাকাত আদায়ে) অস্বীকৃতি জানায়। আবু বকর (রা:) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। তখন উমার (রা:) বললেন- আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন- আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত

থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর অন্য সবকিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) বললেন-

فَقَالَ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি ছলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করবে, আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করবো, কারণ যাকাত হচ্ছে আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রসূল (ﷺ) এর জামানায় দিত, তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি যুদ্ধ করবো। উমার (রা:) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আল্লাহ আবু বকর (রা:) এর বুককে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (তথা ইলহামপ্রাপ্ত করে দিয়েছেন)। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকর (রা:)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। (ছহিহ বুখারী, হা ১৪০০)

সম্মানিত পাঠক, যাকাতের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে আবার অনেক আলেমই কৌশলে নাজায়েজ করে দিয়েছে। বিশেষ করে এই ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই সেই কৌশলে গ্রেফতার হয়েছে। ঐসকল আলেমদের ফতুয়া-

কারো যদি ব্যাংকে ২০ লাখ টাকাও ঋণ থাকে (তথা কোন ব্যবসা বা বাড়ি করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে ১ বছর, ২ বছর কিংবা ৫ বছর তার টাকা পরিশোধের ওয়াদাতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে লোন নেওয়া থাকে) অতঃপর সেই ব্যক্তির নিকটও যদি নগদ ১০ লাখ, ২০ লাখ, ৫০ লাখ টাকা জমা থাকে, যেই টাকার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তবে সেই টাকার যাকাত দেওয়া লাগবে না। (নাউজুবিল্লাহ)

সম্মানিত পাঠক! এমন ফতুয়া কোনভাবেই ইসলামে গ্রহণযোগ্য না। যদি একটু ভেবে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন। আমাদের দেশে তথা বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকগুলো থেকে দুই প্রকারে ঋণ প্রদান করে থাকে।

[১] ক্ষুদ্রঋণ

যা গ্রামে-শহরের কিছু দরিদ্র মানুষদেরকে ব্যাংকগুলো সুদের উপর ৫ হাজার, ১০ হাজার, ২০ হাজার, ৫০ হাজার করে বছর চুক্তি দিয়ে থাকে। যা পরিশোধের নিয়ম- প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট বারে অথবা প্রতি মাসে। এই ঋণ গ্রহণের জন্য তেমন শর্তেরও প্রয়োজন হয় না। বাড়িতে গরু-ছাগল, ভ্যান-রিকসা ইত্যাদি দেখলেই দিয়ে দেয়। এটা সচরাচর গ্রামের মহিলাদেরকেই সামনে রেখে করা হয়।

এই ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা প্রকৃতপক্ষেই ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রস্ত। অতএব, যদি তার নিকট যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়, অথচ সেই ব্যক্তি ব্যাংকের নিকট ঋণগ্রস্ত; তাহলে তার সর্বপ্রথম কাজ হলো- ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে, যদি সেই ঋণ একদিনেই পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকে তবে তখনই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এবং দ্বিতীয় কাজ হলো- ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করেই সেখান থেকেই আল্লাহর নিকট তাওবাহ করতে হবে।

"হে আল্লাহ! এই ঋণ সম্পূর্ণ সুদ যা আমি বুঝে, না বুঝে সুদে জড়িত হয়ে গেছিলাম। এখন আমি এই সুদকে ঘৃণা করি, আর কখনো সুদের উপর টাকা নেব না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও"।

হ্যাঁ, অবশ্যই তাওবা করার সময় তাওবাকারীকে আল্লাহর নিকট বিনয়ী, লাঞ্ছিত, অনুতপ্ত থাকতে হবে এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাওবা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন, ইং শা আল্লাহ। অতএব, ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার পর যদি তার যাকাতের নিসাব পূর্ণ না হয় তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। আর যদি একবারে একদিনে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকে, ১ বছরে অথবা ৬ মাসে টাকা পরিশোধের নিয়ম থাকে; অথচ ঐ ব্যক্তির নিকট নগদ টাকার বা রূপার নিসাব পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তা ১ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে অবশ্যই অবশ্যই ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়ে গেছে। যদি তার আর কোন স্থানে ব্যক্তি বা মালিকানাধীন ঋণ না থাকে।

[২] C.C. (ছিঃ ছিঃ) লোন বা ঋণ।

যা গ্রাম বা শহরের অধিকাংশ বড় বড় ব্যবসায়ী, বা কোম্পানির মালিকগুলো সুদের উপর ১ লাখ, ২ লাখ, ৫ লাখ, ৫ কোটি, ১০ কোটি, ১০০ কোটি টাকাও ঋণ নিয়ে থাকে।

যা পরিশোধের নিয়ম- ১ বছর, তবে তার আগেও পরিশোধ করতে পারবে। আবার ১ বছর পর মূল টাকাটা পরিশোধ না করতে পারলে, মূল টাকার পরিমাণ অনুযায়ী ব্যাংকে সুদের টাকা পরিশোধ করে ঋণ নবায়ন করতে হবে।

এই ঋণ গ্রহণের জন্য অবশ্যই শর্ত রয়েছে। আর তা হলো- যদি আপনি ৫ লাখ টাকা ঋণ নেন তবে আপনাকে অন্তত ১০ লাখ টাকার সম্পদ বা বাড়ির জমির আসল দলিল সহ জামানত স্বরূপ বন্ধক রাখতে হবে। তা ব্যতীত ব্যাংক আপনাকে ঋণ দিবে না। এই ঋণ গ্রহীতা প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকের নিকট ঋণগ্রস্ত নয়। কারণ সেই ব্যক্তি যত টাকা ঋণ নিয়েছে। তার ডাবল টাকার সম্পদ অথবা বাড়ির জমির দলিল ব্যাংকের নিকট বন্দক রেখেছে। আর বন্দক রাখা ইসলামে যায়েজ তবে ঋণ এবং বন্দকের মধ্যে যতটুকু সুদ আছে সম্পূর্ণই হারাম। সুদ ব্যতীত ঋণ বা বন্ধক জায়েজ আছে। যেই বন্দক বা ঋণের মধ্যে সুদের কারবার আছে এর জন্য সুদদাতা, সুদগ্রহীতা এবং সুদের স্বাক্ষরকারী সবাই গুনাহগার।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ‘‘ওরা সকলেই সমান’’। (মুসলিম ১৫৯৭, হাদীস একাডেমী ৩৯৮৫; মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)

অতঃপর, বন্দক রাখা জায়েজ সম্পর্কে আম্মাজান হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

নাবী (ﷺ) এক ইহুদির কাছ থেকে বাকিতে (নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে) খাদ্য ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর মূল্যের জামিন হিসেবে নিজ বর্মকে বন্ধক রেখেছেন। (ছহিহ বুখারী, হা ১৯৩৮)

ইমাম নবাবী (রহি:) এই হাদিছের ব্যাখ্যায় বলেন- উক্ত হাদিছ দ্বারা বন্ধকের বৈধতা প্রমাণিত হয়। শুধু এমনকি কাফেরের কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধকের বৈধতা প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয় বরং মুকিম অবস্থায়ও বন্ধক রাখার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

অতএব, সেই ব্যক্তি ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রস্ত না কারণ সেই ঋণদাতা, ঋণ গ্রহণের সময়ই সেই ঋণ পরিশোধ করে নিয়েছে ঋণের চেয়ে ডাবল টাকার সম্পদ বা বাড়ির জমির দলিলের বিনিময়ে।

যখন সেই ব্যক্তি ব্যাংকের টাকা তার শর্ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দিবে না তখন ব্যাংক তার বন্ধককৃত সম্পদ বা বাড়ির জমি কিংবা বাড়ির প্রতি দখল নিবে। আর এমনটি হয়েছেও শত শত।

সুতরাং সেই ব্যক্তির যদি ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা, ৫ লাখ টাকা, ১০ লাখ টাকা ইত্যাদি তার ডাবল টাকার সম্পদের বিনিময়ে লোন নিয়ে থাকে আর সেই ব্যক্তির নিকট যদি স্বর্ণ-রূপা বা নগদ অর্থের যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয় এবং তা তার নিকটে ১ বছর স্থায়ী থাকে। তাহলে তার সর্বপ্রথম কাজ হলো-

যদি জরুরত থাকে বা ব্যাংকের চাপ থাকে তবে তা তখনই ব্যাংকের নিকট গিয়ে পরিশোধ করতে হবে। তারপর যদি তার নিকট যাকাতের নিসাব পূর্ণ না হয় তবে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। আর যদি সেই টাকা ব্যাংকে

পরিশোধ করার জরুরত না থাকে এবং নিজের কাছেই টাকাটি রেখে দেয়ার ইচ্ছা করে তবে অবশ্যই অবশ্যই তার উপর যাকাত ফরজ। তাকে যাকাত দিতেই হবে। তবে ব্যাংকে টাকা লেন-দেন করা সুদ। আর সুদ অবশ্যই হারাম; তা বর্জন করতে হবে এবং তা থেকে ফিরে আসতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! ভেবে দেখুন, সারা বিশ্বেই এখন প্রায় সকল বড় বড় ব্যবসায়ী, কোম্পানির মালিক তারা প্রায় সকলেই সি.সি. লোনের সঙ্গে জড়িত। আর তাদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা; সমাজ, রাষ্ট্র তাদেরকে ধনী বলেই চেনে, তারা তারাও কাজে-কর্মে এবং বাস্তবতাতে নিজেকে ধনী, শিল্পপতি বলেই পরিচয় দেয়। আর তাদের যাকাত প্রদান করা লাগবে না বলে, জ্ঞানচর্চাহীন আলেম কিভাবে ফতুয়া দেয় যা ইসলামে অগ্রহণযোগ্য? ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক! শুধু তাই নয় এই ফতুয়া মুসলমানদেরকে সুদমুখী করবে। তারা ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার প্রেরণা পাবে। কারণ তারা যাকাতকে জরিমানা মনে করে আর ব্যাংককে বরকত মনে করে। (নাউযুবিল্লাহ)

তারা ব্যাংকের নিকট লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টাকার সম্পদ রেখে দিচ্ছে। আর তাদের যাকাত লাগবে না। এটা তো ব্যাংক কারবারীদের নিকট মধুর বাণী। অবাক করা ফতুয়া! অতএব, ঐসকল যাকাত প্রদানকে জরিমানা মনে করা আলেমদের জন্যও পৃথিবীতে গজব আসে।

জানা প্রয়োজন: এখানে ব্যাংকের একটি বিষয় থেকেই যায়, তা হলো- বাংলাদেশের অনেক মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদ মুক্ত। কিন্তু একটি বার কি চিন্তা করে দেখেছেন যেখানে ইসলামের বিধান দিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, এমনকি পরিবার পর্যন্ত পরিচালনা হয় না, সেখানে ইসলামের বিধান দিয়ে ব্যাংক কিভাবে পরিচালিত হবে? নাকি ইসলামের বিধান কয় নিয়মে চলে তা-ই মুসলমানদের জানা নেই? যদি জানা না থাকে তবে আমি উল্লেখ করছি। তা হলো দুই নিয়মে-

(১) নাবুয়াত ও (২) খিলাফাত। যেহেতু নাবুয়াত বন্ধ তথা আর নাবী-রসূল পৃথিবীতে শারিয়াতী তথা নাবুয়াতি নিয়ে আসবে না। তাই নাবুয়াতি নিয়ম

বন্ধ। তবে নাবুয়াতের আদলে খিলাফাতের মাধ্যমে ইসলামী বিধান পৃথিবীতে চলবে। তাই আমাদেরকে খিলাফাতের দিকেই তাকাতে হবে। আর খিলাফাত পরিচালনার একটি শাখা হলো- 'ইমারাহ'। যেমন, হিন্দস্থান মুসলিমদের অধীনে সম্পূর্ণরূপে আসলে তা একটি 'ইমারাহ'। এমনিভাবে শাম, রূম, পারস্য, আফ্রিকা, আরব, খোরাসান অর্থাৎ আঞ্চলিক যেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, তা হলো- 'ইমারাহ'। আর সেই ইমারাহ-ও গঠন হয় খিলাফাত গঠনের উদ্দেশ্যে। আর কোন একটি অঞ্চলের কোন এক গুপ্তস্থানে মুজাহিদরা জমা হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করে, সেই স্থানকে 'তামকিন' বলে আর সেই তামকিন-ও ইমারাহ গঠনের লক্ষ্যে গঠিত হয়। আর ইমারাহ গঠিত হয় খিলাফাতের লক্ষ্যে।

আমি শুধু সাধারণ মুসলমানদের সহজ ভাবে বুঝার জন্য ইমারাহ ও তামকিনের কথা উল্লেখ করেছি। মূলত ইমারাহ বা তামকিন থেকেও খিলাফাত ঘোষণা দেওয়া যায়, যদি সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত খলীফা বা আমীর থাকেন। খিলাফত ঘোষণার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত খলীফা বা আমীর থাকা শর্ত তবে ইমারত ঘোষণা দেওয়ার জন্য এই শর্ত নাই।

মূলত যেটা বলছি তা হলো- যেহেতু বাংলাদেশে খিলাফাত, ইমারাহ ও তামকিন কিছুই নেই, সেহেতু সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কিভাবে চলে? অর্থাৎ সেখানে ইসলামী বিধান নেই আর ইসলামী বিধানের বিপরীত হলো তগুতি বিধান। যেখানে ইসলামী বিধান নেই সেখানে তগুতি বিধান আছে। আর যেখানে তগুতি বিধান আছে, সেই স্থানে ইসলামী বিধান দিয়ে ইসলামী ব্যাংক কিভাবে চলে?

মূলত এটা একটি ধোঁকা, যেখানে সারা দেশে ইসলাম নেই সেখানে ইসলামকে সব ইসলামী ব্যাংকে জমা করে রাখা হয়েছে। এ কেমন বুদ্ধির কথা? তাছাড়া ঐসকল ইসলামী ব্যাংকগুলোও সুদে পরিপূর্ণ। তারা মানুষকে টাকা ঋণ দিয়ে লাভের মুনাফা নিতে চায়। অথচ ঋণ গ্রহীতা ব্যাবসায় লস করলে সেই লসের ভাগ নিতে চায় না! এ কেমন ইসলামী ব্যাংক!

সম্মানিত পাঠক! বর্তমান আলেমদের একটি ফতুয়া কোটিপতি, শিল্পপতিদের যাকাত মাফ করে দিলেও অন্য দিকে আবার ফতুয়া দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ যাকাতের নামে প্রতিবছরেই বের করে নিচ্ছে। আর সেই ফতুয়া হলো-

ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত প্রতি বছরেই দিতে হবে। অথচ ব্যবহৃত স্বর্ণ-রূপার যাকাত প্রতি বছরেই প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এটা স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে নারীদের জন্য স্বর্ণ-অলংকার ব্যবহার হালাল নাকি হারাম?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মাতের নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন। (সুনানে নাসাঈ, হা ৫২৬৪, সনদ ছহীহ)

অতএব, মুসলিম নারীদের জন্য স্বর্ণ-অলংকার ব্যবহার করা হারাম নয়; বরং হালাল।

মহিলা সাহাবীগণ (রাঃ) নাবী (ﷺ) -এর যুগে স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করেছেন এবং সেই স্বর্ণের যাকাত প্রদানের জন্য আল্লাহর রসূল (ﷺ) আদেশ দিয়েছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، الْمَعْنَى أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا" . قَالَتْ لاَ . قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা:) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকটে আসলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দুটি

স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বললেন, না। তখন রসূল (ﷺ) বললেন- তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা এর পরিবর্তে তোমাকে একজোড়া আগুনের বালা পরিধান করান? রাবী বলেন- একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নাবী (ﷺ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। (আবু দাউদ, হা ১৫৬৩, যাকাত অধ্যায়, গচ্ছিত সম্পদ ও অলংকারের যাকাত অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)

আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- অলংকার পরিধানে কোন সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়। (দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃ:; বায়হাক্বী ৪/১৩৯ পৃ, সনদ হাসান)

এখন বিষয় হলো, ব্যবহৃত স্বর্ণের অলংকারের যাকাত কিভাবে দিবেন। বিশুদ্ধ মতে ব্যবহৃত স্বর্ণের নিসাব পূর্ণ হলে তা ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। (আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে, পৃ: ৬৯; ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা, পৃ: ৪৮)

এখন ভেবে দেখুন! নারীদের জন্য স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করাও হারাম নয় বরং তা হালাল।

অনেক নারী সাহাবীগণ (রা:) তা ব্যবহার করেছেন। এখন যদি কোন নারী অর্থ খরচ করে তার শখের হালাল অলংকার তৈরি করে আর সেই অলংকার থেকে প্রতি বছরেই যাকাত ৪০ ভাগের ১ ভাগ করে প্রদান করতে হয়, তা হলে ৪০ বছরে গিয়ে শখের ব্যবহৃত হালাল অলংকার নাই হয়ে যাবে। ফলে সেই নারীকে ৪০ বছরের মেয়াদে আবার মূলধন নষ্ট করে শখের অলংকার তৈরি করতে হবে। যা মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের প্রতি একটি বড় ধরেনের জুলুম।

অথচ ইসলামে যাকাতের অর্থ দিয়েছে- যাকাত অর্থ বরকত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ১১)

যাকারের আভিধানিক অর্থ কোন কিছু বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১১)

সুতরাং, যদি ব্যবহৃত অলংকার ৪০ বছরে শেষই হয়ে যায়, তাহলে বরকত বা বৃদ্ধি হলো কখন?

অনেকেই বলেন যে, তা অন্যান্য দিক দিয়ে বরকত বা বৃদ্ধি পায়; আবার অনেকেই বলেন যে, মৃত্যুর পরে তার বিনিময় অনেক বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। কিন্তু এর প্রকৃত ব্যাখা হলো-

কোন নারীর নিকট যদি যাকাতের নিসাব পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে সে যদি স্বর্ণের যাকাত দিতে চায়, তবে তার সেই স্বর্ণের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত প্রদান করে সে তার সম্পূর্ণ স্বর্ণকে পবিত্র করে নিবে।

আর এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ

আপনি তাদের সম্পদরাজি থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং সংশোধন করতে পারেন। (সূরাহ তওবা, আ: ১০৩)

অতএব আপনি আপনার এক ভাগ স্বর্ণ দিয়ে সেই স্বর্ণের সম্পূর্ণটাই সারা জীবনের জন্য পবিত্র করে নিলেন যতক্ষণ না আপনার আবার নতুন স্বর্ণ যুক্ত হয়, যার নিসাব পূর্ণ হয়েছে। প্রতি বছরই আপনার স্বর্ণের যেই এক ভাগ স্বর্ণ যাকাত আমীরের পক্ষ হতে নেওয়ার কথা ছিলো তা আর নেওয়া হবে না অর্থাৎ ইসলাম আপনার প্রতি বছরের এক ভাগ স্বর্ণ আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন, ফলে সেই এক ভাগ স্বর্ণ আপনার প্রতি বছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ বরকত হচ্ছে।

এরূপভাবে- অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কারো দোকানে এক লাখ টাকা মূলধনের ঔষধ বা অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে দোকান বা ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এক বছর পর সেই পণ্যের মূলধন ১ লাখ টাকার হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে- লাখে ২৫০০ টাকা।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই এক লাখ টাকা মূলধন ব্যতীত আবার নতুন মূলধনের যাকাতের নিসাব পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত দিতে হবে না, কারণ তার মূলধনের যাকাত বছরে একবারই।

বোঝার জন্য উল্লেখ করছি- (২০২০ ইং সালের ১৬ই রমাদানের ১৮ ক্যারেটের রূপার মূল্য প্রায় ১৩৯৯ টাকা ভরি অনুযায়ী সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা (৭৩, ৪৪৭ টাকা) একজন মুসলিম ব্যক্তির যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়। অতএব, ১ লক্ষ টাকার যাকাত ২৫০০ টাকা প্রদান করলে পরের বছর যদি উক্ত রূপার দাম একই রকম থাকে আর সেই ব্যবসায়ীদের পণ্যের মূলধন দেড় লাখ বা এক লাখ ৬০ হাজারও দাড়ায়, তবুও সেই বাড়তি মূলধনের যাকাত প্রদান করতে হবেনা; যদি মূলধন ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা হয়ে যায় তবে সেই ব্যবসায়ীকে সেই বছর শুধু ৭৫ হাজার টাকার যাকাত দিতে হবে। পূর্বের ১ লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে না। আর এ ভাবেই একজন ব্যবসায়ীকের প্রতি বছর ১ লাখে ২৫ শত টাকা করে বৃদ্ধি পায়। (আলহামদুলিল্লাহ)

যার যতো মূলধন বেশি তার অর্থ তত বৃদ্ধিও পাবে বেশি। আর সেই মুসলিম বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্র ২৫০০ টাকার বিনিময়ে এক লাখ টাকার পণ্য হালাল করে নিলো। সেই পন্য দ্বারা সে আরো বাড়তি টাকা আয় করবে। (সুবহানাল্লাহ)

আর যেই বোকা মুসলিম তা করতে পারবে না সে মাত্র ২৫০০ টাকার যাকাত না দিয়ে এক লাখ টাকার পণ্য হারাম করে নিলো। সেই পন্যের দ্বারা সে আরও বাড়তি টাকা আয় করবে তাও হারাম হবে।

আর এমন হারাম ভক্ষণকারী যাকাত অস্বীকারকারীদের পাপের কারণেও পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব আসে। আর ঐসকল পাপাচারী যালিম ব্যক্তিদের পাপের কারণে গজব আসলে শুধু যে তাদের উপরেই আসবে তা নয় বরং সাধারণ জনগণও সেই গজবে পতিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্যে থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরেই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। (সূরাহ আনফাল, আ: ২৫)

ফিতনার ব্যাখ্যায় উল্লেখ হয়েছে- ফিতনা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা বিপদ, কষ্ট, পরীক্ষা, গজব, আযাব, দাঙ্গা, গোলযোগ, সম্মোহন, আকর্ষণ, শিরক, কুফর, নির্যাতন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(খ)

আল্লাহ তা'য়ালা চান না, তার কোন সৃষ্টিকেই অধিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হোক। সেই ব্যক্তি যদিও আল্লাহর দুশমন, মুমিনদের দুশমন তবুও আল্লাহ তা'য়ালা চান না যে তাঁর সেই বান্দাকেই দুনিয়াতে অন্য কেউ অধিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করুক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরাহ বাকারাহ, আ: ১৯০)

অতএব, যেই সকল যালিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সকল সময়েই লেগে থাকে, মুমিনদেরকে খুন-গুম, গ্রেফতার করতে থাকে, মুমিনদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকে তাদেরকেও আল্লাহ তায়া'লা আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরাও ঐ সকল দুশমনদেরকে হত্যা করো, তবে হত্যার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না।

আর এই বাড়াবাড়ি করা হলো যারা মুসলিমদের অত্যাচার করছে না, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্ত্র ধরছে না, কাফেরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে না; দুশমনদের নারী-শিশু, বৃদ্ধ-অসুস্থ ইত্যাদিকে আক্রমন করা বাড়াবাড়ি, তবে বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত।

অনুরূপভাবে বাড়াবাড়ি হলো- যেই সকল পাপিষ্টদেরকে হত্যা করা হবে, তাদের অঙ্গহানী করা। তাদেরকে হত্যার পূর্বেই নির্মম নির্যাতন করা, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ দুশমনদেরকে হত্যা করার সময়েও ভেবে চিন্তে হত্যা করতে হবে। যেন তার প্রতি বাড়াবাড়ি করা না হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (ছহিহ বুখারী, হা ৭৩৭৬)

অত্র হাদিছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) সকল মানব জাতির উপরেই দয়ার কথা উল্লেখ করেছেন; আর তাদের মধ্যে আল্লাহর সেই সকল দুশমনরাও রয়েছে যারা মুসলিমদের বন্দুকের নলের সামনে মাথা রেখেছে, মুসলিমদের তরবারীর নিচে যেইসকল কাফির দুশমনদের মাথা রয়েছে। অতএব, এই সকল দুশমনরা যদিও জাহান্নামী তবুও তাদেরকে হত্যার সময় যেন তাদেরকে অধিক কষ্ট দিয়ে হত্যা করা না হয় তাই তাদের ঘাড়ে আঘাত করে হত্যার আদেশ দিয়েছেন দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা।

অতএব, ভয়াবহ যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদেরকে অধিক হারে হত্যার পর যেই সকল কাফির জখম হবে, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হবে, সেই সকল বন্দীদেরকে শক্তভাবে বেঁধে আমীরুল মুজাহিদীনের নিকটে নিয়ে যেতে হবে।

কাফির বন্দীদের ক্ষেত্রে আমীরুল মুজাহিদীনের ইচ্ছা

অতএব, আমীরুল মুজাহিদীন পরিস্থিতির উপর সিদ্ধান্ত নিবেন ঐসকল বন্দীদেরকে কোন শর্ত ছাড়াই ছেড়ে দিবেন নাকি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিবেন।

"এটাই আল্লাহর বিধান বা ইচ্ছা"

অনেক উদার প্রকৃতির মুসলিম আছে যারা মুশরিকদের দালাল মুসলিম লেবাসধারী, ইসলামের চূড়ান্ত এক দুশমন; যারা উদরতা দেখিয়ে বলে থাকে- 'বর্তমানে সশস্ত্র জিহাদ ইসলামে জায়েজ নেই। আমরা অস্ত্র হাতে নিয়ে জাতিসংঘের নিকট সন্ত্রাস হতে চাই না। রক্তপাত যুদ্ধ বর্তমানে ইসলাম সমর্থন করে না' ইত্যাদি। ঐ সকল লেবাসধারী ইসলামের দুশমনরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা কিভাবে করবে?

আরেক শ্রেণির সাধু মোল্লাহ আছে তারা মাসজিদে মাসজিদে ঘুড়ে পিকনিক করে বেড়ায় আর বলে থাকে- কেউ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর এক গালে থাপ্পড় মারলে আরেক গাল পেতে দিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলতেন- নেন চাচা আরেক গালে মারেন। এমন মিথ্যা, ভিত্তিহীন ওয়াজ করে তারা মুশরিকদেরকে খুশি রাখছে আর মুসলিম যুবকদের জিহাদী প্রেরণা ধ্বংস করে তাদের হাতে পঙ্গুত্বের শিকল পড়িয়ে দিচ্ছে।

আবার তাদের সামনে আলোচ্য আয়াতের মত আয়াতগুলো উপস্থাপন করলে আ হুঁ করে পাশ কাটিয়ে যায়। তারা বলে- ইসলামে ধরো মারো এমন কোন আয়াত নেই। যা আছে তার অর্থ শুধু বড় বড় মুফতিরা জানবে। যারা তাফসীরকারক তারাই শুধু অর্থওয়ালা কুরআন পড়বে। অন্য কেউ পড়লে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি।

তাদের উদ্দেশ্যেই শুধু আয়াতের এই অংশটুকু যে, "এটাই আল্লাহর বিধান বা ইচ্ছা" আর তা হলো- বাতিলরা যখন অতি বেড়ে যাবে, মুসলিমদের প্রতি খুন, গুম, গ্রেফতার, যুলুম, নির্যাতন বাড়িয়ে দিবে তখন তাদেকেও কচু কাটার মতো কাটতে হবে। তাদেরকে গুলি করে মাথার মগজ উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে জাহান্নামের দরজার নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে বন্দি করতে হবে। শক্তভাবে বাঁধতে হবে, তারপরে আমীরে জিহাদের ইচ্ছা- তাদেরকে এমনিও ছাড়তে পারেন আবার মুক্তিপণ নিয়েও ছাড়তে পারেন।

আর হকের হাতে বাতিলদেরকে কঠিনভাবে শাস্তি দিবেন এটাই আল্লাহ তা'য়ালার বিধান বা ইচ্ছা। এতে যদি মুশরিক ও তার বন্ধু লেবাসধারী মুসলিমদের অন্তরজ্বালা হয় তবুও কিছু করার নেই। বরং তাদেরও নাক ধুলোমলিন হবে।

আবার কিছু মুসলিম ভাইরা বলতে পারে যে- 'ইচ্ছে করলে তো আল্লাহ তাঁর দুশমনদেরকে হত্যা করতে পারতেন। তাহলে আবার মুমিনদেরকে এই আদেশ দিলেন কেন যে তোমরা কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত কর অর্থাৎ হত্যা কর?'

ঐসকল মুসলিম ভাইদের প্রশ্নের উত্তরটাও আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন। আর তা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ

আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।

অতএব, প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা সম্পর্কে। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿۱﴾

সর্বোচ্চ ও সুমহান তিনি, যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরাহ মুলক, আ: ১)

উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ''তাবারক'' দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছেন যার অর্থ মহা মহিমান্বিত, মহা মর্যাদাসম্পন্ন।

বারকাত শব্দ থেকেই ''তাবারক'' বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ অধিক হওয়া, বেশি হওয়া। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালার মান, মর্যাদা, ক্ষমতা সকল কিছুই সর্বাধিক, সবচেয়ে বেশি, সেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেই সর্বোচ্চ সুমহান বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও উক্ত আয়াতের পরের অংশেই আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে কারণেও উক্ত আয়াতের প্রথমাংশের তাবারক অর্থাৎ বেশি হওয়া অর্থে মুফাসসিরগণ আল্লাহ তা'আলার অধিক ক্ষমতা হওয়াকেও বুঝিয়েছেন।

যদি আমরা একটু স্থির হয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি এবং সম্মানিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করি, তাহলেই বুঝতে পারবো মহান আল্লাহ তা'য়ালার "অধিক ক্ষমতা" সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। (সূরাহ নিসা, আ: ১২৬)

[এছাড়াও পড়ুন- সূরাহ আনআমের ৯৫-৯৯ নং আয়াত; সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, পৃঃ-১০-১১]

অতএব একথা স্পষ্ট যে, একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক ক্ষমতাবান, অধিক শক্তিশালী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱﴾

তিনিই অর্থাৎ আল্লাহই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরাহ মুলক, আ: ১; আয়াতের শেষাংশ)

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক ক্ষমতাবান সবচেয়ে; সকল বিষয়েই সর্বশক্তিমান। সেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি আদেশই যথেষ্ট যে, হও। অমনিই বাতিলরা পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে উৎখাত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। আর যখন তিনি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল বলেন "হও" ফলে তা হয়ে যায়। (সূরাহ বাকারাহ, আ: ১১৭)

তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দিয়ে অন্যদের তথা হককে দিয়ে বাতিলের অনুসারীদেরকে ধ্বংস করতে চান কেন?

সম্মানিত পাঠক! মূলত আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত দ্বারা এই কথা বুঝান নি যে, তিনি কোন কিছুকে "হও" বললেই সেটা আমাদের দৃষ্টির সামনে সাথে সাথে ঘটে যায়। বরং কোন কিছুকে "হও" বলাটা আমাদের জানা বাস্তবতার বাইরে ঘটে। সেটি কোন স্থান বা কালের মধ্যে ঘটে না। কিন্তু তার আদেশের বাস্তবায়ন যখন আমাদের পরিচিত স্থান বা কালের মধ্যে ঘটে, তখন সেটা স্থান বা কালের গন্ডির মধ্যেই ঘটে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

ঈসার উদাহরণ হলো আদমের মতো, যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাকে বলেছিলেন "হও" আর তিনি হয়ে যান। (সূরাহ আলে ইমরান, আ: ৫৯)

অতএব আমরা জানি, হযরত ঈসা (আঃ) একদিন হঠাৎ করে জন্ম হননি। বরং তাঁর মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। অতঃপর অধিক প্রসব বেদনার মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়েছেন। সেটা এতটাই ভয়ঙ্কর কষ্টের ছিল যে, তার মা তাকে জন্ম দেয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, আল্লাহর কাছে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَاَجَاۗءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি স্থানে চলে গেল। অতঃপর প্রসব বেদনা তাকে খেজুর গাছের কান্ডের কাছে নিয়ে এলো। সে বলল, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং (মানুষের) স্মৃতি থেকে মুছে যেতাম। (সূরাহ মারইয়াম, আ: ২২-২৩)

অতএব, আল্লাহ তা'য়ালার "হও" বলা মানে এটা নয় যে, তৎক্ষণাৎই আমাদের দৃষ্টির সামনে হয়ে যায়। বরং আসমান ও জমিন সহ সকল কিছুই

আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছে। এই সকল কিছু আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে হবে আর ইচ্ছে না করলে হবে না।

আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছুই একটা নিয়ম-নীতি এবং ধারাবাহিকতার মাধ্যমে করেন, যেন তা হতে বান্দাগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু কেন তিনি সরাসরি নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আমাদের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করেছেন। আর তা হলো-

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্য আমাদেরকে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন না বরং বান্দার প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন। আর সেই প্রয়োজন বা কল্যাণের বিষয় নিয়ে আমি সামনে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

তবে তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দ্বারাই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান?

তার মূল কারণ হলো- আমাদেরকে পরীক্ষা করা, এত আনন্দময় জীবন আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দান করেছেন এবং তার সমাপ্তি হিসেবে মৃত্যুও দান করেছেন। আর জীবনের এই সময়টুকুতে আমরা আল্লাহর আদেশ পালন করছি কিনা, তা কি মহান আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন না? অবশ্যই দেখবেন। তিনি দেখবেন তাঁর কোন বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্য করছে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত আছে। তাঁর কোন বান্দা তাঁর আদেশ পালনের চেয়ে নিজের জীবন, নিজের সম্পদ, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে বেশি ভালোবাসছে। কোন বান্দাটি আল্লাহর আদেশ পালনের পরিবর্তে দুনিয়াকে অধিক ভালোবাসছে। এই সকল কিছু দেখার জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দুশমনদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কাজটি আমাদেরকে

দিয়েছেন। যেন সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কাজটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের স্পষ্ট পরীক্ষা নিতে পারেন।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু দেখার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ। (সূরহ মুলক, আ: ২)

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা যদি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করি তবুও দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (সুবহান আল্লাহ)

অথচ ভেবে দেখুন, আল্লাহর দুশমনদের কাছ থেকে যে আমরা প্রতিশোধ গ্রহণের যুদ্ধে নামছি, সেটাও আমাদের নিজেদের জন্যেই।তা হলো- বাতিলরা আমাদের উপরে জুলুম-নির্যাতন করে, খুন-গুম করে, নির্মমভাবে হত্যা করে, আমাদের সম্মান নষ্ট করে, আমাদের সম্পদ দখল করে, আর এজন্যই বাতিলরা আল্লাহর দুশমন হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল কর্ম করতে নিষেধ করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। অতএব বাতিলরা যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে। তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালার দুশমন হিসেবে তারা চিহ্নিত হয়ে যায়। আর সেই জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তার মুমিন বান্দাদের আদেশ দিয়েছেন। যেটা মুমিন বান্দা হিসেবে আমাদেরই প্রয়োজন এবং কল্যাণকর। কিন্তু তবুও দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রয়োজনীয় সে কাজকেই আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন। আর সেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি, তবে তাতেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আর সে মহামূল্যবান পুরস্কারটি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনোই তাদের আমল সমূহ বিফলে দিবেন না। অর্থাৎ নিহত মুজাহিদ দুনিয়ার জীবনে যত আমল করেছেন ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার সকল আমল কবুল করে নেবেন। (সুবহানাল্লাহ)

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী মুজাহিদীনদের পক্ষে আল্লাহর বার্তা

▪ আয়াত-৫ ও ৬

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

(৫) অচিরেই তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থার উন্নয়ন করবেন। (৬) এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

আলোচনা :

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুজাহিদীনদের জন্য একটি ঘোষণা দিয়েছেন। তা হলো-

যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী, যারা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টাকারী, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাওহীদের কালিমা উত্তোলনের লক্ষ্যে বাতিলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মুজাহিদগণ।

তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থার উন্নয়ন করবেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কাজের তৌফিক দান করবেন, যার ফলে মুজাহিদীনদের জন্য জান্নাতের পথ অতি সহজ হয়ে যাবে। (সুবহান আল্লাহ)

একনিষ্ঠ মুজাহিদীনদের জন্য যে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন তা নয়, বরং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- (একনিষ্ঠ মুজাহিদীনদের মৃত্যুর পরপরই) মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম)

জান্নাত :

জান্নাত মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি পুরষ্কারের নাম। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর সমূহ। এটাই বিরাট সফলতা। (সূরহ বুরুজ, আ: ১১)

তবে এই জান্নাতের বেশ কিছু উপাধি রয়েছে যা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নিচে জান্নাতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাধি উল্লেখ করা হলো-

✍ আদ-দারুল আখিরহ; অর্থ আখিরাতের আবাস। দারুল আখিরহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

এই হচ্ছে দারুল আখিরহ, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি যারা জমিনে অহংকার দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর উত্তম পরিনাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরহ কাসাস, আ: ৮৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু নয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য দারুল আখিরহ উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না? (সূরহ আনআম, আ: ৩২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

আর এই দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয়ই দারুল আখিরহ-ই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো। (সূরহ আনকাবুত, আ: ৬৪)

✍ আল-মাক্বমিন আমীন; অর্থ নিরাপদ স্থান। মাক্বমিন আমীন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে আল-মাক্বমিন আমীনে। (সূরহ দুখান, আ: ৫১)

✍ মাক্বআদ ছিদক্ব; অর্থ যথাযোগ্য আসন। মাক্বআদ ছিদক সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

নিশ্চই মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা ধারার মধ্যে 'মাক্বআদ ছিদকে', সর্বশক্তিমান মহা অধিপতির নিকটে। (সূরহ কমার, আ: ৫৪-৫৫)

✍ দারুল ক্বরর; অর্থ স্থায়ী আবাস। দারুল করর সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ قَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা আমায় সাহায্য কর। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার কওম! এই দুনিয়ার জীবন কেবল ক্ষণস্থায়ী ভোগ। আর আখিরাতই হলো দারুল করর। (সূরহ মুমিন (গফির), আ: ৩৮-৩৯)

✍ তুবা; অর্থ আনন্দময় জীবন। তুবা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস-

وَزَادَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوْبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

আবূ হুরাইরা (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেছন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়। না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। তাদের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে নাহ। ঐ ব্যক্তির জন্য তুবা, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যার মাথার চুল উস্ক-খুস্ক এবং পা ধূলিমলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর দলের পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না। (ছহিহ বুখারী, হা: ২৮৮৭)

জান্নাতের গুরুত্বপূর্ণ আটটি দরজা রয়েছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

[১] জান্নাতুল ফিরদাউস : জান্নাতুল ফিরাদাউস সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

তারাই হবে ওয়ারিস যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরহ মু'মিনুন, আ: ১০-১১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (সূরহ কাহফ, আ: ১০৭)

[২] জান্নাতুল আদন : জান্নাতুল আদন সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

জান্নাতু আদন, যার প্রতিশ্রুতি পরম দয়াময় নিজ বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে। নিশ্চয়ই তার ওয়াদাকৃত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। (সূরহ মারিয়াম, আ: ৬১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ

এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে জান্নাতু আদন, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। (সূরহ কাহফ, আ: ৩১)

[৩] জান্নাতুল খুলদ : জান্নাতুল খুলদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿۱۵﴾

বলো, সেটা উত্তম না জান্নাতুল খুলদ। মুত্তাকীদের যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। তা হবে তাদের পুরষ্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরহ ফুরক্বন, আ: ১৫)

[৪] জান্নাতুন নাঈম : জান্নাতুন নাঈম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۳۴﴾

নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে জান্নাতুন নাঈম। (সূরহ কলাম, আ: ৩৪)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۹﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের রব ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন জান্নাতুন নাঈমের, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। (সূরহ ইউনুস, আ: ৯)

[৫] জান্নাতুল মা'ওয়া : জান্নাতুল মা'ওয়া সম্পর্ক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿۱۳﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿۱۴﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿۱۵﴾

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল ছিদরাতুল মুনহাতার নিকট, যার নিকট অবস্থিত 'জান্নাতুল মা'ওয়া'। (সূরহ নাজম, আ: ১৩-১৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, তাদের মেহমানদারীর জন্য রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া। (সূরহ সাজদাহ, আ: ১৯)

[৬] জান্নাতুর রাইয়ান :

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতুর রাইয়ান সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস- হযরত সাহল (রা:) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে ছাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (ছহিহ বুখারী, হা: ১৮৯৬)

[৭] দারুস সালাম : দারুস সালাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

আল্লাহ মানুষকে দারুস সালামের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (সূরহ ইউনুস, আ: ২৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে দারুস সালাম এবং তারা যা করত তার কারণে তিনি হবেন তাদের বন্ধু। (সূরহ আনআম, আ: ১২৭)

[৮] দারুল মুক্বমাহ : দারুল মুক্বমাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, মহা গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দারুল মুক্বমাহতে স্থান দিয়েছেন। যেখানে কোনো কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না এবং যেখানে কোনো ক্লান্তিও আমাদের স্পর্শ করে না। (সূরহ ফাতির, আ: ৩৫)

আল্লাহর সাহায্য মুজাহিদীনদের জন্য

▪ আয়াত-৭

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন।

আলোচনা :

উপরে উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিন বান্দাগণকে তথা যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূল (ﷺ) কে বিশ্বাস করেন তাদেরকে আহ্বান করছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাগণকে ডাক দিয়ে বলেছেন- হে (আমার) মুমিন বান্দাগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন।

এই আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ৪টি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। আর বিষয় ৪টি হলো-

[১]

মুমিন : মুমিন কাকে বলে? মুমিন অর্থ বিশ্বাসী। এমন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে মু'মিন বলে যারা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ নিষেধের বিষয়গুলোকে না দেখেই বিশ্বাস করে। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করে, ছলাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা তাতে বিশ্বাস করে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরহ বাকারহ, আ: ৩-৪)

অর্থাৎ দেখে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে না বরং না দেখে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলে। অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাই আদেশ-নিষেধ করেছেন তা কোনরূপ যুক্তিপ্রমাণ ও বাস্তব প্রমাণের চিন্তা না করেই, মহান আল্লাহ তা'য়ালার যে কোন আদেশ-নিষেধকে নির্দ্বিধায় আনন্দ চিত্তে মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে।

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে যদি কেউ সাহায্য করতে চায়, তবে সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী অর্থাৎ মুমিন হতে হবে। কারণ উপরে উল্লেখিত আহ্বানটা মুমিন বান্দাদের জন্যই। অবিশ্বাসীদের জন্য নয়।

[২]

আল্লাহকে সাহায্য করা : আমাদেরকে দেখতে হবে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ কি?

এই বিষয়ে বিদ্যানগণদের সকলের ঐক্যমত যে, আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা। এখন এখানে দুইটি প্রশ্ন হতে পারে।

(ক) আল্লাহর দ্বীন কি?

(খ) আমরা তো আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের মধ্যেই রয়েছি। ছলাত-ছিয়াম পালন করি, যাকাত প্রদান করি এবং দান-ছদাকাহ করে থাকি। এর চেয়ে আর কী ভাবে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হবো?

প্রশ্ন দুটির উত্তর সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

প্রশ্ন : আল্লাহর দ্বীন কি?

উত্তর : এখানে আল্লাহর দ্বীন বলতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের বিধান বুঝানো হয়েছে। আর সেটাই হলো ইসলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। (সূরহ আলে-ইমরান, আ: ১৯)

প্রশ্ন : আমরা তো আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের মধ্যেই রয়েছি। ছলাত-ছিয়াম পালন করি, যাকাত প্রদান করি এবং দান-ছদাকাহ করে থাকি। এর চেয়ে আর কী ভাবে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হবো?

উত্তর : সাধারণ শ্রেণীর ঈমানদার মানুষের মূল সমস্যাই হলো এখনে। তারা মনে করে যে ছলাত-ছিয়াম, হাজ্জ-যাকাত বা দান-ছদাকাহ করলেই আল্লাহর দ্বীন পালন করা হয়ে যায় বা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা হয়ে যায়। মূলত এটা তাদের নিজেদেরই মনগড়া/তৈরী করা একটি বুঝ। যার সাথে কুরআন-সুন্নাহের কোনো মিল নেই। কারণ ছলাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত পালন করা আল্লাহর দ্বীনের কোনো সাহায্য করা নয় বরং তা বান্দা হিসেবে নিজেদের উপরেই দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমীরুল মুজাহিদীনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মারিয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলো, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। (সূরহ ছফ, আ: ১৪)

অতএব, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই ঈমানদারগণের একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে। কারণ, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) কে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۹﴾

তিনিই তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল (বাতিল) দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরহ ছফ, আ: ৯)

সুতরাং, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল বাতিল দ্বীনকে পরাজিত করা।

কাজেই আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর উম্মাত হিসেবে প্রত্যেক মু'মিন বান্দাদের একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমীরুল মুজাহিদীনকে সার্বিকভাবে সাহায্য করাই হলো আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করা। অর্থাৎ আল্লাহকে সাহায্য করা।

[৩]

আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া : আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুইটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

(ক) মু'মিন হওয়া।

(খ) আল্লাহর সহায্যকারী হওয়া।

কাজেই যখন কোনো বান্দা মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির আশায় আল্লাহকে সাহায্য করবে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে যাবে। তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নেন, সেই বান্দাকে সাহায্য করা। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরহ হাজ্জ, আ: ৪০)

অতএব, ঈমান আনার পর সেই বান্দা মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে আল্লাহর দ্বীনের পথে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই বান্দার ব্যাপারে আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন তাকে সাহায্য করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

প্রশ্ন : তাহলে সেই বান্দা কিভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন? শুধু আখিরাতেই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন? না কি দুনিয়ার বিষয়েও সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন?

উত্তর : অবশ্যই তিনি দুনিয়া ও আখিরাত, উভয় জগতেই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

[৪]

আল্লাহর সাহায্যের পরিচয় : অত্র আয়াতের শেষাংশের আলোচনা এটি। যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন'। অতএব আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ বান্দাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই সাহায্য করবেন।

আল্লাহর সাহায্যে আমাদের পা সুদৃঢ় রাখার দুইটি দিক রয়েছে।

(ক) ইহকালের সাহায্য

(খ) পরকালের সাহায্য

ইহকালের সাহায্য

ইহকালের সাহায্যে পা দৃঢ় রাখার অর্থ হলো বাতিলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করা। ফলে মুজাহিদীনরা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাতিলের ভূমি বিজয় করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মারিয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলো, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বনি ইসরাইলের মধ্যে থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর একদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর, যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর উপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হলো। (সূরহ ছফ, আ: ১৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সাহায্য করার ফলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনেক দুর্বলকেই আল্লাহর জমিনে কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

আর স্বরণ কর! যখন তোমারা ছিলে অল্প, তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো জমিনে। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে ছো মেরে তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দান করেছেন; যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (সূরহ আনফাল, আ: ২৬)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে সেই বান্দাগণের জন্য রয়েছে ইহকালের সাহায্য। যেই বান্দাগণ ঈমান আনার পর আল্লাহ তা'য়ালাকে সাহায্য করেন।

পরকালের সাহায্য

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন'। অর্থাৎ ইসলামের পথে দ্বীন কায়িমের পথে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সুদৃঢ় করে দিবেন। যেই বান্দাটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করে যাবে এবং দুনিয়াবী কোন নিফাক তার অন্তরে রাখবে না। সেই বান্দাটিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এমন সাহায্য করবেন যে, দুনিয়ার জীবনে ঈমানের পথে তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। যার ফলে সে পরকালীন জীবনে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। যার ফলে শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করে শত্রুর ভূমি বিজয় করবেন এবং সে ইহকালীন জীবনে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কেননা অত্র আয়াতাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার উভয় জগতের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ আয়াতটি নাযিল হয়েছে বাতিলের সাথে মু'মিনদের যুদ্ধে বিজয়ের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এটা ইহকালীন সাহায্য। আর ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখাই বান্দার প্রকৃত সাহায্য। যা বান্দার পরকালীন সাহায্য।

কুফুরীর পরিণতি

▪ আয়াত-৮ ও ৯

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

(৮) যারা কুফুরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (৯) এটা এই জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ব্যর্থ করে দিবেন।

আলোচনা :

উপরে উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুফুরীর দুইটি পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) লাঞ্ছনা / শাস্তি।

(২) তারা দুনিয়াতে যতো ভালো কর্মই করুক না কেন; আল্লাহ তা'য়ালা ভালো কর্মগুলোকে ব্যর্থ করে দিবেন।

অর্থাৎ কুফরী এমন একটি গুনাহ, যা মানুষকে জান্নাতের পথ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা যায় খুব সহজেই। (নাউজুবিল্লাহ)

সুতরাং যেই কুফরীর পরিণতি এতো ভয়াবহ সেই কুফরী সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদেরকে সুষ্ঠু ধারণা রাখতে হবে। তা ব্যতীত এই কুফরী হতে বেঁচে থাকা সহজ হবে না।

অতএব, প্রত্যেক মুমিন বান্দার জন্য কুফরী গুনাহ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা রাখা জরুরী। যা প্রথম আয়াতের আলোচনায় আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। অতঃপর কুফরী গুনাহ সম্পর্কে নিম্নে আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম।

কুফরীর সংজ্ঞা: কুফরী শব্দটি অত্র আয়াতের কাফারু শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে যা কুফরুন (كُفْرٌ) ধাতু হতে নেয়া। যার আভিধানিক অর্থ হলো আবৃত বা ঢেকে রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় কাফির অর্থ- যে ব্যক্তি কুরআন নির্দেশিত সত্য গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে।

আর এই কুফরী মূলত দই প্রকার। যথা:

(১) বড় কুফরী।

(২) ছোট কুফরী।

[১]

বড় কুফরী এমন কুফরীকে বলা হয় যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। এটা মূল দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পর্যায়ের কুফরীর মধ্যে পড়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে গাল-মন্দ করা অথবা আল্লাহর দ্বীন, তার রসূল, তার শরীয়াকে গাল মন্দ করা। অথবা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করা।

অথবা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখ্যান করা অথবা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধের কোনো একটিকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা। অথবা আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করেছেন তা হালাল বা বৈধ করা এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা হালাল বা বৈধ করেছেন তা হারাম বা অবৈধ করা।

(১.১) মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে গাল-মন্দ করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾

যারা আল্লাহ ও রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (সূরহ আহযাব, আ: ৫৭)

(১.২) মহান আল্লাহ তা'য়ালার রসূল (ﷺ) কে গাল-মন্দ করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

এবং তাদের মধ্যে এমনো লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে তো কর্ণপাতকারী। বল, তার কর্ণ তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তা-ই শোনে। সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। (সূরহ তাওবা, আ: ৬১)

হযরত কাযী ইয়ায (রহি:) বলেন- যে ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে অপমান করবে কিংবা অন্য কোনো নবীকে অপমান করবে কিংবা মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে কিংবা তাদেরকে কষ্ট দিবে কিংবা কোন নবীকে হত্যা করবে কিংবা কোন নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। (আশ শিফা বি তা'রিফিল মুস্তফা, ২/২৮৪)

ইসলাম নিয়ে উপহাস করা বড় কুফরী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۭ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۭ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۗىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে? উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা, উপহাস-পরিহাস করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াত সমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন অযুহাত পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছো। (সূরহ তাওবা, আ: ৬৫-৬৬)

(১.৩) মহান আল্লাহ তা'য়ালার আয়াতকে অস্বীকার করা বড় কুফরী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়নের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও। এই সব লোক যাদের কর্মসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নষ্ট হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ২১-২২)

(১.৪) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ অস্বীকার করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন। (সূরহ বাকারহ, আ: ৮৫)

(১.৫) হালালকে হারাম করা আর হারামকে হালাল করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদের আলেম ও পীর-ফকীরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরহ তাওবা, আ: ৩১)

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ "يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ" . وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ "أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ" . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ . وَغُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ .

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা:) আল্লাহর নবী (ﷺ) কে এই আয়াত পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন- ওরা তো তাদের ইবাদাত করে না। আল্লাহর রসূল (ছ:) বলেছিলেন- তা বটে। কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা ওদেরকে তা হালাল করে দিলে ওরা তা হালালই মনে করে। একইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা যা হালাল করেছেন তারা ওদেরকে তা হারাম করে দিলে ওরা তা হারামই মনে করে। (তিরমিজি হাদিস নং: ৩০৯৫, মান হাসান)

(১.৬) আল্লাহর ইবাদাতে শিরক করা বা অংশীদার স্থাপন করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

তুমি আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকে ইলাহ স্থীর করো না। করিলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরহ বানী ঈসরাইল, আ: ৩৯)

(১.৭) আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরি করা, তাদেরকে ডাকা এবং তাদের নিকটে শাফায়াত কামনা বড় কুফরী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ قُلْ اَتُنَبِّـــُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলো, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে উর্ধ্বে। (সূরহ ইউনূস, আ: ১৮)

জানা প্রয়োজন- এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা দলিল হিসেবে উল্লেখ করে সূরহ মায়েদার ৩৫ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও তার নৈকট্য লাভের উছিলা তালাশ কর ও তার পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে-

قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: الوسيلة القربة.

وقال قتادة: يقربون إليه بطاعته والعمل بما يرضيه.

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহি:) পর্যায়ক্রমে, তার পিতা, তালহা, আতা, ইবনে আব্বাস (রা:) এর সনদে বলেছেন- "ওছিলা অর্থ নৈকট্য লাভের চেষ্টা

করা''। হযরত কাতাদা (রহি:) বলেন- ''এর মর্মার্থ হলো 'আমল দ্বারা' নৈকট্য লাভ করা''। (তাফসিরে ইবনে কাসির, খন্ড ২, পৃ: ১৫)

অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওছিলা হিসেবে পীর-ফকিরের হাতে বায়াত করা শরিয়া সম্মত নয়। কাজেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন পীর-ফকিরকে মাধ্যম হিসেবে রাখা, মৃত পীরের ওছিলা করে দু'আ করা শিরক। তবে জীবিত কোনো সৎ ব্যক্তির উছিলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা যাবে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

উমার (রা:) (এর খিলাফতকালে) যখন অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হতেন তখন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা:) কে দিয়ে বৃষ্টির দু'আ করাতেন। অতঃপর বলতেন: হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবী (ﷺ) এর উছিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করতাম। ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আমাদের নবী (ছ:) এর চাচার উছিলায়। অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা:) বলেন- তখন বৃষ্টিপাত হতো। (ছহিহ বুখারী হা ৩৭১০, মান সহিহ)

(১.৮) মুশরিকদের কাফের মনে না করা। তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং তাদের মতবাদ সমূহকে সঠিক মনে করা বড় কুফরী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (সূরহ বাইয়্যিনাহ, আ: ৬)

জানা প্রয়োজন- অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুশরিকদের স্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, মুশরিকরা সৃষ্টির অধম।

সুতরাং, যারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই ঘোষণাকে তোয়াক্কা না করে; যারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার চেয়ে অধিক উদারতার পরিচয় দেখিয়ে, জেনে বুঝে মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশছে। তাদের মূর্তিপূজাকে সমর্থন করছে। তারা মূলত আল্লাহর আদেশের অবমাননা করছে; যা বড় কুফরী। তাদের পরিচয় মহান আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

অতঃপর তারা যদি তাওবা করে (অর্থাৎ মুশরিকরা যদি শিরক থেকে তাওবা করে), ছলাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্ট রূপে বিবৃত করি। (সূরহ তাওবা, আ: ১১)

সুতরাং মুশরিকদের ভাই বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসলিমদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অতঃপর এটা তো গেলো মুশরিকদের আপন করে নেয়ার বিষয়।

তাছাড়াও ইসলাম বিধ্বংসী স্বার্থলোভী কিছু জ্ঞান পাপী যারা দুনিয়ার কিছু নিকৃষ্ট স্বার্থের জন্য এমন উক্তি প্রচার করে যা মুখে বলা বা অন্তরে লালন করা উভয়ই ঈমান থেকে বের করে দেয়। তারা বলে- রোজা আর পূজা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ (নাউযুবিল্লাহ)। এই উক্তি দ্বারা সেই ব্যক্তি মুশরিকদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে। কেননা তার দৃষ্টিতে মুসলমানদের রোজা বা সিয়াম আর মুশরিকদের পূজা বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য রবের ইবাদাত দুটোই সমান। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে বোঝাচ্ছে যে

মুশরিকদের মতবাদও সঠিক (নাউজুবিল্লাহ)। ফলে ঐসকল নেতাগণ তাদের কুফুরি উক্তির কারণে মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (নাউজুবিল্লাহ)

(১.৯) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ মনে করা অথবা ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরি হুকুমাত উত্তম মনে করা বড় কুফরী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

আর আল্লাহ ও তার রসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকেনা। আর যে আল্লাহ ও তার রসূলকে অমান্য করল! সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। (সূরহ আহযাব, আ: ৩৬)

বর্তমানে এই শ্রেণীর বড় কুফরী মতবাদের প্রথম সারিতে রয়েছে "গণতন্ত্র"।

গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা

গণতন্ত্র যা বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তর এক মতবাদের নাম। যা ইসলামী মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। যা একটি বড় কুফরী।

যদিও বর্তমানে অনেক স্বার্থান্বেষী আলেমরা এবং ইসলামের জ্ঞান হতে জাহেল ব্যক্তিরা মনে করে থাকে যে, গণতন্ত্র কুফরী না। তারা বলে থাকে যে কুরআন হাদিসের কোথাও-ই গণতন্ত্রকে কুফরী বলা হয় নি; যারা কুফরী বলছে তারা মাসআলাগত বিষয়ে বলছে। এই সকল স্বার্থান্বেষী আলেম ও জাহেল ব্যক্তিদের গণতন্ত্র নিয়ে সুধারণা রাখার মূল কারণ হলো তারা নিজেরাই গণতন্ত্রের ধারক-বাহক। এই সকল লোকদের উদাহরণ ঐ সকল আলেমের ন্যায়, যারা নিজেরা তামাক-জর্দা দিয়ে পান খায়, আর যারা সিগারেট-বিড়ি খায় তাদেরকে বলে মাকরূহ, মুবাহ। ফলে দেশে মাদকাসক্ত লোকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

এবার আসুন জেনে নেই, গণতন্ত্র প্রকৃতই একটি কুফরী মতবাদ। যা মাসলাগত কোনো বিষয় নয়। প্রথমেই জেনে নেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, গণতন্ত্র কি এবং কি তার পরিচয়।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

আইনের অধ্যাপক ড. আব্দুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন- 'শাসন ব্যবস্থা "গণতন্ত্র" জাতির প্রভুত্বের অর্থাৎ রবের নীতিতে পরিণত হয়েছে। অধিকন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই।' (Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Developing Country, ড. হামিদ মিতওয়ালী এর রুলিং সিস্টেম ইন ডেভেলপিং কান্ট্রী, সংস্করণ-১৯৮৫, পৃ: ৬২৫)

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেন- 'প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্ত সমূহ পূর্ণবিবেচনা করার মত কোনো বৈধ কর্তৃত্বেরও অধিকারী নেই।' (জোসেফ ফ্রঙ্কেল এর The International Relationship, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশীপ, তুহামা পাবলিশিং: ১৯৮৪, পৃ: ২৫)

বিষয়টিকে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সে গেটিসবার্গে এক বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে- 'গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার'।

এখন দেখেন গণতন্ত্রের মূলধারা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধান কি বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর ধারা দুইতে বলা হয়েছে- 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরুপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' (বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার

ঘোষণা- চতুর্দশ সংশোধিত পরবর্তী প্রকাশিত, এম. এ. সালাম রচিত, কালার সিটি কর্তৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯)

সংক্ষিপ্তভাবে যদি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে হয় তবে আমি বলবো- "গণ মানুষের রায় বা সিদ্ধান্তকেই গণতন্ত্র বলে। অতএব অত্র সংজ্ঞাগুলো থেকে স্পষ্টই জানা যায় গণতন্ত্রের মূল উৎস হলো 'জনগণ'। জনগণ বলতে গণমানুষকে বোঝায়। অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষ মিলেই যেই রায় বা সিদ্ধান্ত দেয় সেটাই হলো গণতন্ত্র।"

এবার ভালোভাবে দেখে নিন, গণতন্ত্র কি চায়?
গণতন্ত্র চায় অধিকাংশ মানুষের সিদ্ধান্তের উপর রাষ্ট্রীয় কাজ সমাধা করতে। আর এই অধিকাংশ মানুষের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে দেখুন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

আর যদি তুমি যারা জমিনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারনারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমান করে। (সূরহ আনআম, আ: ১১৬)

এখন ভালোভাবে দেখুন মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেখানে বলেছেন, অধিকাংশের আনুগত্য করা যাবে না, অধিকাংশের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না! সেখানে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা। যা বড় কুফরী।

দুঃখের বিষয় হলো গণতন্ত্র কুফরী মতবাদ স্পষ্ট বোঝার পরেও জ্ঞান পাপীরা 'এটা মাসলাগত বিষয়' এর দোহাই দিয়ে উল্লেখিত আয়াতের একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে আয়াতের মূল শিক্ষাকেই অস্বীকার করে যায়। তারা তখন গণতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়।

তারা বলে- ‘ইসলামে শুরা পদ্ধতিও গণতন্ত্রের ন্যায়ই। কারণ ইসলামে শুরা মাজলিসেও একাধিক মানুষের পরামর্শকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়।’ (নাউজুবিল্লাহ)

সম্মানিত পাঠক! এটা একটি মারাত্মক বিষয় যে তারা তাদের দুনিয়াবি কিছু নিকৃষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্য গণতন্ত্র ও শুরাকে এক করে ফেলে। অথচ শুরা আর গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মুমিন আর কাফেরের মত পার্থক্য। শুরার জন্য কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করলাম।

শুরা ও গণতন্ত্রের পার্থক্য

ইসলামী দলগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ কোনো কাজ বা পরামর্শের জন্য যে কোনো মুসলিমের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। অথবা একজন খলিফা খিলাফতের অধীনে থাকা মুসলিম নাগরিকগণকে নিয়ে একত্রে বসে পরামর্শের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতিই হলো ‘শুরা’। তবে শুরার মূল শর্ত হলো শুরা সদস্যগণ খলিফাকে শুধু পরামর্শই প্রদান করতে পারবেন। সেই পরামর্শ গ্রহণ করা আর না করা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একমাত্র খলিফারই এখতিয়ার ভুক্ত।

অপরদিকে গণতন্ত্র মূল ভিত্তি হল- তারা মনে করে মুসলিম, মুনাফিক, কাফির, মুশরিক, মুরতাদ, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ সকলের ভোটই মূল্যবান এবং সকলেরই পার্লামেন্টে বসার অধিকার আছে।

এই ব্যাপারে ইসলামের সাথে সবচেয়ে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো হলো- ‘একজন আলেমের ভোটের মূল্য এবং একজন ব্যভিচারীর, ধর্ষকের আর নেশাগ্রস্ত মুশরিকদের ভোটের মূল্য একই সমান’!

যেমন কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

বল, আসমানসমূহ ও জমিনের রব কে? বল, আল্লাহ। তুমি বল, তোমরা কি তাকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো, যারা তাদের নিজেদের কোন উপকার অথবা অপকারের মালিক না? বল, অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? (সূরহ রা'দ, আ: ১৬)

এখন ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ তা'য়ালাই তার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন যে, একজন অপবিত্র মুশরিক আর একজন মুমিন কখনোই সমান হতে পারে না। আর গণতন্ত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার সেই বিধানকেই অস্বীকার করে নতুন একটি বিধান তৈরী করে দিয়েছে।

আর তা হলো, একজন আলেমের ভোটের মূল্য আর একজন অপবিত্র মুশরিকের ভোটের মূল্য সমান সমান। যা স্পষ্ট এক বড় কুফরী। কারণ ইসলাম বলছে- বাইতুল মুকাররমের খতিব মাও: আব্দুল মালেক (হাফি:) আর চিনময় দাস এক সমান নয়। কারণ চিনময় দাস চক্ষুহীন, অন্ধ, অন্ধকারাছন্ন, অপবিত্র মুশরিক। আর মাও: আব্দুল মালেক (হাফি:) চক্ষুমান, আলোকাছন্ন এবং একজন মুমিন। মুশরিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে ও মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে স্থায়ী ভাবে। ওরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। (সূরহ বাইয়্যিনাহ, আ: ৬)

আর মুমিনদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে; তারাই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট। (সূরহ বাইয়্যিনাহ, আ: ৭)

আর গণতন্ত্র বলে যে- মুমিন, মুশরিক, মুরতাদ নাই। গণতন্ত্রের কাছে সবাই সমান। (নাউজুবিল্লাহ)

প্রিয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন, যদি ইসকন নেতা চিন্ময় দাস একটা ভোট দেয়, নির্বাচন কমিশন সেই একটা ভোটই গণনা করবে।
আবার বাইতুল মুকাররমের ইমাম মাও: আব্দুল মালেক (হাফি:) সাহেব যদি একটা ভোট দেয়; তা নির্বাচন কমিশন জাতীয় ইমাম হিসেবে ভোট ১০ টা গণনা করবে না। বরং একটা ভোটই গণনা করবে। কাজেই মুশরিকদের উপরে মুমিনদের যেই মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন। গণতন্ত্র তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, যা বড় কুফরী।

সম্মানিত পাঠক!
এবার দেখুন গণতন্ত্রের প্রধান একটি নীতি হলো- 'কোনো রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক কোনো সরকার থাকলে, সেই রাষ্ট্রে একটি বিরোধী দল থাকতে হবে'। আর ইসলাম বলে, 'খিলাফার ভূমিতে খলিফার বিরোধী দল থাকা যাবে না'।

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا "

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি দুই খলিফার জন্য বায়াত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে। (ছহিহ মুসলিম ই.ফা., অধ্যায়- রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন, হাদিস নং ৪৬৪৬, মান সহিহ)

وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ "

হযরত আরফাজা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি- তোমাদের এক আমীরের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে চেষ্টা করে অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে

চায়; তাকে তোমরা হত্যা করবে। (ছহিহ মুসলিম ই.ফা., অধ্যায়- রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন, হাদিস নং ৪৬৪৫, মান সহিহ)

অর্থাৎ ইসলামের বিধানকে অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল ও নেতা রাখার যেই বিধান গণতন্ত্র দ্বারা তৈরী হয়েছে, তা বড় কুফরী।
সুতরাং যারা বুঝতে পারেন না যে গণতন্ত্র কুফরী। তারা অত্র লেখাটি পড়ে নিরপেক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ।

(১.১০) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ করা বড় কুফরী। যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিবেন; তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করে দিবেন। (সূরহ মুহাম্মাদ, আ: ৮-৯)

(১.১১) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনীত দ্বীনের কোনো বিষয় অথবা ইসলামের ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা বড় কুফরী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো। অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল! আল্লাহ, তার আয়াত সমূহ

ও তার রসূলের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা অযুহাত পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।' (সূরহ তাওবা, আ: ৬৫-৬৬)

(১.১২) যাদুর মাধ্যমে ভালো বা মন্দ কিছু অর্জন করা অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা বিচ্ছেদ ঘটাতে গোপনে বা প্রকাশ্যে তন্ত্র-মন্ত্র করা অথবা ছেলে মেয়ের সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বের ফাটল ধরাতে চাওয়া বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত। (সূরহ বাকারহ, আ: ১০২)

(১.১৩) মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (সূরহ মুমতাহিনা, আ: ১)

(১.১৪) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আনীত শরিয়াত ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে জীবন পরিচালনা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে, এমন কথা মুখে উচ্চারণ করা বা অন্তরে বিশ্বাস করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরহ আলে ইমরান, আ: ৮৫)

আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বড় কুফরী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۲﴾

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরহ সাজদাহ, আ: ২২)

(১.১৫) আল্লাহর রসূল (ﷺ) শেষ নাবী ও শেষ রসূল একথা বিশ্বাস না করা অথবা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর পরেও আরো কোনো নাবী বা রসূল আসবে বা আসছে একথা বিশ্বাস করা বড় কুফরী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং নবীদের শেষ (খাতামুন নাবিয়্যীন)। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরহ আহযাব, আ: ৪০)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন,

وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده ﷺ فهو كافر

"যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর পরে নবুয়তের দাবী করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির- এ বিষয়ে উম্মাতের ইজমা রয়েছে।" (তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আহযাব ৩৩:৪০ এর তাফসীর)

ইমাম ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফী (রহঃ) বলেন,

فمن ادَّعى النبوة بعده ﷺ فهو كافرٌ، ومن صدَّقه في دعواه فهو كافرٌ.

"রসূল ﷺ এর পরে যে কেউ নবুয়তের দাবী করে সে কাফির। আর যে তাকে সত্য বলে সেও কাফির।" (শারহু আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ, ইমাম ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফী (রহঃ), পৃষ্ঠাঃ ৫২৮–৫২৯, মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত)

[২]

ছোট কুফরী হলো শরিয়তের দলিল তাকে কুফর বলেছে ঠিকই, কিন্তু তত বড় কুফর নয়। বড় কুফর হলো যেগুলো মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়; এবং শাস্তিস্বরূপ মহান আল্লাহ তাকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন (নাউজুবিল্লাহ)। আর ছোট কুফর মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না; তবে ছোট কুফরীর কারণে কবিরাহ গোনাহ সংঘটিত হয়। আর ছোট কুফরকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামে দিলেও তার নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগের পর আবার জান্নাত দান করবেন।

(২.১) মুসলমান-মুসলমান যুদ্ধ করা ছোট কুফরী।

হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) বলেছেন,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।' (সুনান ইবনু মাজাহ ৩৯৩৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মিমাংসা কর। (সূরহ হুজুরাত, আ: ১০)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

অতঃপর হত্যাকারীকে তার (নিহত) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়। তবে (নিহতের ওয়ারিশগণ) সেই নিয়মের অনুসরণ করবে এবং হত্যাকারী উত্তমভাবে তাকে তা প্রদান করবে। (সূরহ বাকারহ, আ: ১৭৮)

(২.২) আল্লাহর দেয়া রিযিক লাভের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা ছোট কুফরী।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এক জনপদের; যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত। যেখানে সর্বাদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ আসতো। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করলো, ফলে তারা যা করত তাজন্যে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের স্বাদ গ্রহণ করালেন। (সূরহ নাহল, আ: ১১২)

(২.৩) অন্যের বংশের প্রতি তাচ্ছিল্য করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিগণকে স্বরণ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা ছোট কুফরী।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ"

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- দুটো স্বভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে যা কুফরী বলে গণ্য। এক) অন্যের বংশের প্রতি তাচ্ছিল্য করা। দুই) মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা। (ছহিহ মুসলিম, ই. ফা. হাদিস নং ১৩১, মান-ছহিহ)

(২.৪) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা ছোট কুফরী।

হযরত সাদ ইবনু উবাইদা (রা:) বলেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سَمِعَ رَجُلاً، يَقُولُ لاَ وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ"

ইবনে উমর (রা:) একজন লোককে বলতে শুনলেন- কা'বার কসম! ইবনু উমর বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্যকিছুর নামে কসম করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে আমি বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'য়ালার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে লোক কসম করল সে যেন কুফরী করলো অথবা শিরক করল।' (সুনান আত তিরমিজি, হা: ১৫৩৫, মান: ছহিহ)

(২.৫) পিতার পরিচয় অস্বীকার করা ছোট কুফরী।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন,

أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- তোমরা তোমাদের পিতৃ পরিচয়কে অস্বীকৃতি জানিও না। যে স্বীয় পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করলো, সে কুফরী করলো। (ছহিহ বুখারী, হা ৬৭৬৮, মান ছহিহ)

(২.৬) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা অথবা গণকের নিকট যাওয়া ছোট কুফরী।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه

وسلم - "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"

নাবী (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রী লোকের সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে অথবা গণকের নিকট যায়। সে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যা নাযিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কুফরী করে। (সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস ৬৩৯, মান: ছহিহ)

সম্মানিত পাঠক!

আমরা দুই প্রকার কুফরী সম্পর্কেই অত্র আলোচনা থেকে জানলাম। যার এক প্রকার হলো বড় কুফরী আর অন্যটা হলো ছোট কুফরী।

যদিও মহান আল্লাহ তা'য়ালা অত্র সূরহ 'সূরহ মুহাম্মাদ' এর ৮ নং আয়াতে বড় কুফরীর কথাই উল্লেখ করেছেন। যেহেতু আমরা বড় কুফরী সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা পেয়েছি এবং বড় কুফরীর পরিণতি স্থায়ীভাবে জাহান্নাম, সেই সম্পর্কেও অবগত হয়েছি।

অতঃপর বান্দা যত ভালো কাজই করুক না কেন, যদি সে বড় কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হয় এবং সে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে দিবেন এবং তার ভালো কোনো কাজই উপকারে আসবে না। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার সেই ভালো কর্মগুলোকে গ্রহণই করবেন না।

কাজেই যে যতোই ভালো কাজ করুক না কেন; তার ঈমান সম্পর্কেই তাকে বেশি যত্নবান হতে হবে। যেন তার ঈমান বিশুদ্ধ হয়। তা ব্যতীত মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার কোনো ভালো কাজই গ্রহণ করবেন না। এর জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

'আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন'। (সূরহ মুহাম্মাদ, আ: ৯)

ফলে তার কুফরির পরিণতি হবে স্থায়ীভাবে জাহান্নাম। (নাউযুবিল্লাহ)

কুফুরীকারীদের জন্য
মহান আল্লাহ তায়ালার সাবধান বাণী

- **আয়াত-১০ ও ১১**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

(১০) তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিলো? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (১১) এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তো মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবক নাই।

আলোচনা :

উপরে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমত কাফেরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন যে- 'তোমরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো নাই? যদি পরিভ্রমণ না করে থাকো তবে পরিভ্রমণ করে নাও। তোমরা তোমাদের নিজের চোখেই ঘুরে ঘুরে দেখে নাও। তাদের অবস্থা; যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তী কুফফারদের পথ তোমরা ছেড়ে দাও এবং মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসো। তাদের অবস্থা কি হয়েছিল? নিজের চোখে তোমরা দেখে নাও। তাদের সেই ধ্বংসাবশেষ এখন পৃথিবীতে রয়েছে। যদি তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে না আসো, তবে তোমাদের অবস্থাও অনুরূপই হবে।'

পরের আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন সম্প্রদায়ের মাওলা অর্থাৎ অভিভাবক। আর কাফের সম্প্রদায়ের কোনো মাওলা নাই।

সুতরাং এখনো সময় আছে। তোমরা তোমাদের অভিভাবককে গ্রহণ কর এবং মাওলার দিকে ফিরে আসো। তা ব্যতীত আসমান, জমিনে এমন কেউ বা কিছু নেই যে আল্লাহর বিপরীতে গিয়ে তোমাদের অভিভাবক হবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে- হযরত বারাআ ইবনে আযিব (রা:) বলেন (হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশ)-

قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِيْ ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَا تُجِيْبُوْا لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَا تُجِيْبُوْا لَهُ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

‘আবু সুফিয়ান (উহুদ যুদ্ধের দিন) বলল, আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির মত। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কাটা দেখবে। আমি এর আদেশ দেইনি। আবার তা আমি পছন্দও করিনি। অতঃপর বলতে লাগলো- হে হুবাল! তোমার মাথা উঁচু হোক। হে হুবাল! তোমার মাথা উঁচু হোক। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) সাহাবাগণকে বললেন- তোমরা এর উত্তর দিবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি বলব? তিনি বললেন- তোমরা বল, আল্লাহ তা’য়ালা সবচেয়ে মর্যাদাবান। তিনি মহা মহিমান্বিত। আবু সুফিয়ান বললো- আমাদের জন্য উয্যা রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই। নাবী (ﷺ) বললেন- তোমরা কি উত্তর দেবে না? বারাআ (রা:) বলেন, সাহাবীগণ (রা:) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি বলবো? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা বল- আল্লাহ আমাদের মাওলা/অভিভাবক, তোমাদের কোনো মাওলা নেই অর্থাৎ অভিভাবক নেই’। (ছহিহ বুখারী, তা.পা., হা. নং ৩০৩৯)

আল্লাহই আমাদের মাওলা আর তিনিই আমাদের সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকেই কুফরী হতে হেফাজত করুন। আমীন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

প্রথম পর্ব
সমাপ্ত

নোট

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. মুক্তির পয়গাম
১০. ইসলামে সামাজিক জীবন
১১. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৩. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৪. আল্লাহর পথের পথিক
১৫. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৬. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
১৭. তরজমায়ে সূরা মুহাম্মাদ
১৮. বিচার দিবস

শেষ্টিম প্রকাশনী